জয়াকে

এই লেখকের

উপন্যাস

অভিনয়ের নায়ক

দুই দ্বীপ

পিপাসা

দীপবতী (যন্ত্রস্থ)

গল্প

কলাবতী

বরনারী

নহবৎ

নাটক

ডিরোজিয়ো

কন্যকা

॥ চিত্তরঞ্জন ঘোষ ॥
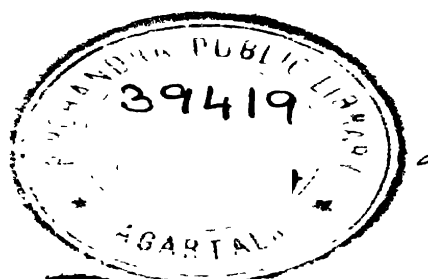
সাহিত্যায়ন

৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

প্রকাশক
সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়
সাহিত্যায়ন
৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
বি, এন, ঘোষ
আইডিয়াল প্রেস
১২, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
নীতিশ মুখোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদমুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

। শেখর ।

দৃশ্য। একটা নয় বহু। অগণ্য। পুরো নয় কোনটা। ছেঁড়া-ছেঁড়া। কাটা কাটা। মেশানো। জড়ানো। পাকানো। স্তূপীকৃত। একটা পুরো ফোটবার আগেই আর একটা স্বরু হয়ে যায়। সেটারও আয়ু দীর্ঘ নয়। একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই। বহু ক্ষেত্রে বিরোধ আছে। দর্জির ছাঁট কাপড়ের লাট যেন। দৃশ্যগুলো সজীব, এই যা পার্থক্য। শেখরের মন।

আধুনিক মানুষের মন এই। অন্তত শেখর তাই মনে করে। এটা মনে করে সে সান্ত্বনা পায়, সে একা নয়। হয়তো ঘটনাচক্রে সে একটু বেশি 'আধুনিক' হয়ে গেছে। ফলে নিজের মনের একমাত্র উপমা সে খুঁজে পায় কোন কোন আধুনিক ছবিতে। কাঁচের ওপর আঁকা অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন ছবি ভেঙ্গে তার বিষম টুকরোগুলোকে কে যেন এলোপাথাড়ি ভাবে জুড়ে দিয়েছে। শেখর ভাবে, একটু উলটে বলা হলো কথাটা। ছবির মত মন নয়। আসলে মনের প্রতিরূপ ছবি। কারণ মন থেকেই ছবির জন্ম। শেখর মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়, স্বয়ং পিকাসোও এর থেকে মুক্তি পান নি, যদিও তিনি মনের দিক থেকে একটি সংহত মতবাদে বিশ্বাসী।

আজ আরো বিশেষ করে তারগুলো জট পাকিয়ে গেছে মনের যন্তরে। ভাল-লাগা মন্দ-লাগার তার। জট-পাকানো তার বেজে চলেছে—কী এক অদ্ভুত মিশ্র রাগে। কত দৃশ্য, কত মুখ, কত কথা। টোপন, রুমী, চন্দনা, কান্তি, স্নুবর্ণা, পাটের ফেঁসো-ওড়া রাস্তা, মজদুর ইউনিয়ন, রমজান আলী, সুরেনদা।

সুরেনদা আর রমজানকে সে বলে এসেছে যে সে আজ আসতে পারবে না। আজ তার ছুটি। যদিও এ কাজ স্বেচ্ছাবৃত, প্রাক্-

স্বাধীনতা যুগের ছাত্র আন্দোলনের উত্তুঙ্গ মুহূর্তকে অতিক্রম করবার পর থেকে এই পাট কলটির মজুর ইউনিয়নের অন্যতম সংগঠনকর্মী সে, তবু ছুটি পেতেও শেখরের ভাল লাগে। বোধহয় ছোটবেলার অভ্যেসটা হাড়ে হাড়ে বসে আছে। হাসে শেখর। অথবা তার মনটা এই জীবনের মধ্যে আজও ভাল করে বসে নি। হাসিটা মেলাতে স্বরু করে।

না, আজ সে গোমড়া মুখে ভাবতে বসবে না। কেন ভাল করে ওখানে সে নিজেকে মেশাতে পারে নি—এই চিন্তার জটিলতা থেকে আজ সে নিজেকে মুক্ত রাখবে। আজ ছুটি। আজ সে ভুলে যাবে। ঐ ধুলো, ধোঁয়া আর পাটের ফেঁসোয় ভরা জগৎটাকে ভুলে থাকবে। আজ সে চলে আসবে, থেকে যাবে কলকাতা শহরের সংস্কৃত অঞ্চলে। জলের মাছ জলে। অবশ্য সেই জন্যই শুধু খুশী নয় সে। ছুটি পেলেই তার ভাল লাগে। দম আটকানো কাজের ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ এক ঝলক তাজা হাওয়া, একটু আকাশ, একটি অখণ্ড অলসতা, ব্যাপ্ত এক কল্পনার আকাশে ডানা মেলে দেওয়া, হয়তো সেঁটাকে একটু গুটিয়ে নিয়ে কলমের ডগায় ধরবার চেষ্টা, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে একটু হাসি-ঠাট্টা-গল্প করা, ছায়া-নামা বিকেলে টোপনকে একবারটি দেখে আসা, অনেক রাত্তির পর্যন্ত পড়া, নানা কথা ভাবা, চোখের পাতা দুটো আলাদা রাখবার দুরূহ চেষ্টায় ঝিমোনো। আর চন্দনা যদি থাকে কলকাতায়—!

চন্দনা চিঠি লিখেছে। আসবে। এর আগেও এসেছে—অনেকবার। কিন্তু এবারের চিঠিটাতে ভিন্ন একটা স্বর আছে। অনেক অস্ফুট আবেগ জমে জমে কথাগুলো দানা বেঁধেছে। একটা স্বরের তরঙ্গ কাঁপছে কথাগুলোর মধ্যে। সে স্বর শেখরের মধ্যেও মৃদু লয়ে বাজছে। চন্দনা আসছে। আসবে আজ। চিঠিটা এসেছে কয়েক দিন আগে। কিন্তু নানা কাজের ভীড় ঠেলে যেন চিঠিটা এগোতে পারছিল না, শুধু স্বরের কম্পনটা তাকে ছুঁয়ে ছিল

—সব কাজের মধ্যেও। আজ চিঠির অবাধ আবির্ভাব। চিঠির জগতেই রয়েছে শেখর। চিঠি আর ছুটির মিতালি ঘটেছে।

অবশ্য পুরো ছুটি নয়। একটা কাজ আছে। সেই জন্যে বেরোতে হবে। যেতে হবে কয়েক জায়গায় কয়েকটি বন্ধুর কাছে। কঠিন কাজ নয়। বরং সে সাগ্রহে নিয়েছে কাজটা। কান্তি ও সুবর্ণার 'পুনর্মিলন' উপলক্ষ্যে বন্ধুরা যেন আগামী রবিবার কান্তির বাড়িতে যায়, চা-পান করে। এই আমন্ত্রণ জানাবে শেখর ওদের দুজনের হয়ে। শক্ত কাজ নয়। বরং এই কাজটা নিয়ে কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে সে একটু আড্ডা দেবে। দূত-কর্তব্যের থেকে সেটায় আগ্রহ বেশি তার। যত দিন যাচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা তত কমে যাচ্ছে। ছাত্রজীবনের দিনগুলো বন্ধু-সঙ্গে আকণ্ঠ পূর্ণ ছিল। তারপর ক্রমে সবাই ছিটকে যেতে লাগল চাকুরী, ব্যবসা, রাজনীতি, বিদেশ-যাত্রা, উচ্চশিক্ষা, কেরিয়ার, বিবাহ, স্ত্রী, শ্বশুরালয়, সন্তান ইত্যাদির ধাক্কায়। এখন দেখা সাক্ষাৎ কম ঘটে। তার বাড়ীতে বিশেষ কেউ আসে না,—কর্মব্যস্ত বলে, শেখরকে পাবে না বলে। বরং সে অকস্মাৎ এক এক সময় আবির্ভূত হয় এক এক জনের বাড়িতে। গিয়ে দেখে বন্ধুরা সংসারাচ্ছন্ন। ভাল। কিন্তু পুরোনো দিনের উল্লাস ও উদ্দামতার স্বাদ পাওয়া যায় না। বয়স হচ্ছে। শুধু ওদেরই হচ্ছে? শেখরের হচ্ছে না? তিরিশ পেরিয়ে গেছে সে। আধুনিক বাংলা ভাষায় রীতিমত 'উত্তর-তিরিশ'। ওরা বয়সের চেয়ে আগে ছুটে যাচ্ছে যেন বার্ধক্যের দিকে, আর সে বয়সের পেছনে রয়েছে খানিকটা। তার এই আপেক্ষিক তারুণ্যকে অনেকে ব্যাখ্যা করে, 'সংসার-দায় নেই তাই' বলে। কিন্তু এককালে তারও সংসার-দায় ছিল, তখন—।

সত্যি, সে দিনগুলো কত দূরে চলে গেছে! মাত্র কয়েক বছর আগেও শেখর দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে ছিল। কটি বছর! মাত্র!

কিন্তু মনে হয় অনেক দিন আগের কথা। প্রায় ভুলেই গেছে সে। মনে পড়েছে এক আধবার, কিন্তু মনে রাখবার চেষ্টা করেনি। যখন সম্পর্কটার পত্তন হয়েছিল, তখন ভাবেনি ভাঙবে এটা। তখন *প্রথম যৌবনের উন্মাদনা-দৃষ্টি ছিল চোখে, আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে* কাটেনি সেটা। হঠাৎ কেটেছে। বিয়ের অল্প পরেই। তারপর সেই বিরক্তিকর গ্লানিটা একটা পর্ব তারপর উভয়ের মুক্তি। বিচ্ছেদ। রুমী আর শেখর দুজনেই বেঁচে গেল।

কিন্তু এত সহজে বোধহয় মানুষ বাঁচে না। তাই সে মরণ আজ অন্যভাবে শেখরকে আর রুমীকে সাপটে আছে—বিচ্ছিন্নতার পরেও, বিভিন্ন-বাস সত্ত্বেও।

মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে টোপন। দুই বিপরীতমুখী ধারার সন্ধিবিন্দু। বিপুল আকর্ষণে সে আকৃষ্ট করে কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো আকাশচারী গ্রহ কয়েক দিনের জন্য পারস্পরিক সান্নিধ্যে এসে পড়েছিল, আবার তারা মহাশূন্যের দুই প্রান্তে বিলীন হয়ে যেত, একে অপরের সন্ধান পর্যন্ত রাখত না। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র জোতিষ্কের চারদিকে বিপরীত অক্ষপথে তারা ঘুরছে। নিকটতর অক্ষপথে আছে রুমী। রুমীর কাছে থাকে টোপন। শেখরকে যেতে হয় মাঝে মাঝে ওখানে টোপনের টানে। রুমীর সংগে সংযোগের ক্ষীণ সেতু একটা রয়েই গেছে। সম্পর্কহীন এই নিত্য সংযোগ এক বিড়ম্বনা বিশেষ। রুমীও বোঝে সেটা, শেখর দেখা করতে গেলে সে বেশীর ভাগ সময় আড়াল হবার চেষ্টা করে। কিন্তু একটু বাদে শেখর-টোপনের কাছে এসে উপস্থিত হয়। রুমীর অদ্ভুত একটা ভয় আছে—এই বুঝি টোপন শেখরের উত্তাপে অভিভূত হয়ে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। এই আশঙ্কায় সে দূরে থাকতে পারে না। মধ্যে এসে হাজির হয়। শেখর এটা পছন্দ করে না। ভাল লাগে না এই মধ্যবর্তিনীকে। সে তাদের দুজনের মধ্যে এসে দাঁড়ালে, টোপনকে শেখর ভাল করে পূর্ণভাবে পায় না, রুমী বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রুমীর

সামনে এখন টোপনকে একটু আদর করতেও তার বাধে, রাগ হতে থাকে তার। রুমী মনে মনে হাসে, পরিস্থিতিটা উপভোগ করে। টোপনকে শেখর যেমন করে নিজের সংগে মিশিয়ে নিতে চায় তা হয় না। তবু তাকে যেতে হয়। বার বার। আরো যেতে হবে। ততদিন, যতদিন না টোপর বাবার কাছে আসবার বয়স অর্জন করে।

রুমী খবর দিয়েছে শেখরকে দেখা করবার জন্য। আজই যেন শেখর দেখা করে। এই চিন্তাটা তার ছুটি, চিঠি আর পুনর্মিলনের খুশী-খুশী সুরটাকে ভেঙে এলোমেলো করে দিচ্ছে।

কি বলবে রুমী! হঠাৎ খবর দিল কেন। এমনভাবে খবর সে শেখরকে দেয় না, দেখা করতে চায়নি সে বিচ্ছেদের পর কোন দিন।

রুমী বাইরে—বোধহয় দিল্লীতে একটা চাকরী পেয়েছে, বলেছিল আগে একদিন, ওখানে সে যাবে কিনা ভাবছিল। শেখর বারণ করেছে। যদিও সে বারণের কোন মূল্য নেই তা সে জানে। তবু করেছিল। রুবীর কোন ব্যাপারে সে এখন থাকে না। কিন্তু এ ব্যাপারে না বলে উপায় ছিল না। টোপনের জন্যে। রুমী গেলে টোপনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। শেখর তাই বাধা দিয়েছে। রুমী 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলে নি সেদিন। শুধু শুনেছে। সেই ব্যাপারেই কি কিছু বলবে আজ ?

টোপনের কথা জানতে চায় চন্দনাও—প্রায় প্রতিটি চিঠিতে। অথচ কতটুকু সে দেখেছে টোপনকে। সামান্য। খুব সামান্য। একেবারে ছোটবেলার টোপনকে দেখেছে সে। তারপর বহুদিন টোপন তার চোখের বাইরে। ইদানীং টোপনকে নিয়ে বাইরে বেরোতে পারে না শেখর। রুমী দেয় না। নইলে টোপনের সঙ্গে হয়তো দেখা হতো চন্দনার। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, রুমী ততই যেন আগলে রাখছে টোপনকে—যেন তাকে হারাবার ভয়ে

সদা-উৎকণ্ঠ! আর তার সব চেয়ে বড় ভয় শেখরকে। শেখরই এক পারে টোপনকে পর করে দিতে। অধিকার তার কম নয়। তার ও টোপনের মাঝখানে রুমীর এই বেড়া তুলে দেওয়ার চেষ্টাকে সে ভাল চোখে দেখে না। এমন কি এক এক দিন টোপনকে দেখতে গিয়ে অতৃপ্তির দুঃখবোধ নিয়ে ফিরতে হয়। আজকাল এমন দিনের সংখ্যা কম নয়। বিক্ষিপ্ত কর্মতান বিস্তারের পরে যেখানে শেখর বার বার ফিরে এসে একটু নিজেকে পেতে চায়, সে হচ্ছে টোপন। সেই সম-স্থিতির সময়টুকুর জন্য শেখর তৃষ্ণাত হয়ে থাকে; অথচ সেই মুহূর্তগুলো দিনের পর দিন ব্যর্থ হয়ে যায়। এ জন্যে শেখরের রাগও ধরে মাঝে মাঝে রুমীর ওপর। কিন্তু নীরবে সইতে হয়। রুমীকে কিছু বলে লাভ নেই। রুমী এটা জেনে শুনে ইচ্ছে করেই করে। শেখরের অতৃপ্ত অসহায় কাতর অবস্থাটা সে উপভোগ করে। শেখরের জীবনের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে রুমী উদাসীন। এই একটা যায়গায় অতি মাত্রায় সচেতন। নিজেকে সে একটা প্রতিদ্বন্দ্বীর আসনে খাড়া করে সূক্ষ্ম অস্ত্রের মুখে যন্ত্রণা নিক্ষেপ করে শেখরের দিকে। শেখর জ্বলে। অতৃপ্তিতে, রাগে। কিছু বলে না। জানে, বললে রুমী আরো বাড়াবে। বরং সহিষ্ণু ঔদাসীন্যে নীরব থাকা শ্রেয়। আর স্বপ্ন দেখে সেই দিনের, যে-দিন বয়স বৃদ্ধি হেতু সন্তানের ওপর পিতার অধিকার কায়েম হবে। তখন সে টোপনকে নিয়ে আসবে তার কাছে।

এ কথা রুমীও জানে। তাই হয়তো টোপনকে সে আঁকড়ে ধরে আগলে আছে। সে জানে, প্রতিটি সূর্যাস্ত টোপনকে কাছে রাখার মুহূর্তকে সংকুচিত করে দিচ্ছে। আর প্রতিটি সূর্যোদয় তার মধ্যে যেন নতুন প্রতিহিংসার বীজ বোনে। প্রতিদিন সে বেড়াটাকে আর একটু বিস্তৃত করবার চেষ্টা করে, পাঁচিলে আর একটা ইঁট লাগিয়ে সেটাকে চওড়া করে। আর যে ক-বছর রুমীর পাওনা আছে, তারই মধ্যে সে শেখর- টোপনের ব্যবধানটা বাড়িয়ে

বাড়িয়ে এমন যায়গায় নিয়ে যেতে চায় যে শেখরের পাওনা-কালেও সে যেন তাকে না পায়। টোপনের মনকে রুমী বিষিয়ে দিচ্ছে, অন্তত বিরূপ করে দিচ্ছে শেখর সম্পর্কে। এটা তার এক মস্ত অশান্তির কারণ হয়ে আছে। সর্বক্ষণ ওটা কোন এক অদৃশ্য পাত্র থেকে বিন্দু বিন্দু ঝরতে থাকে তার মনের ওপর, তার মনের সব ফাটলগুলোর ভেতর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়তে থাকে। যে কোন কাজ বা চিন্তাকেই ছোঁয়া যাক, সেই অদৃশ্য পাত্রের ক্ষরণের স্পর্শ লাগবে। ইউনিয়নের অফিসে বসে নানা সমস্যা-সংকুলতার মধ্যে এক এক সময় সেই স্পর্শ এত তীব্র হয়ে লাগে যে কাজ ফেলে তখনি ছুটতে হয় দক্ষিণ কলকাতার ঐ ঘরটির দিকে, যেখানে টোপন আছে। সে আছে, শুধু আছে, এইটুকু অনুভব করবার জন্যই শেখরকে যেতে হয়। যেটুকু অনুভব করা যায়, টোপনকে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, তার গলা শোনা যায়। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সেই ছায়াটা এসে দাঁড়ায়, ঘন নারীমূর্তি। দাঁড়ায় টোপন আর তার মাঝখানে। তাকে সরানো যায় না। একদিন যখন ছোট্ট টোপন আর একটু বড় হবে, যখন এ ঘরের খাঁচা থেকে শেখর তাকে নিয়ে যাবে, তখন—? তখনও কি ছায়াটা দুলবে অমনি মধ্যখানে? অথবা ছায়াটা আরো পরোক্ষ, আরো ঘন আকার নেবে টোপনের মনে? সারা জীবন সে ছুটে ছুটে আসবে টোপনের মনের দরজায়, আর ব্যাহত হয়ে থাকবে? থাকবে তখনও যখন টোপন থাকবে তার কাছে? তারই একাংশ তারই সান্নিধ্যে থেকেও থাকবে অনেক দূরে? কোন দিন সে টোপনের সেই দরজাটা খুলতে পারবে না? চাবিটা হাতড়ে ফিরবে, দরজায় ধাক্কা দেবে? দরজা খুলবে না, ধাক্কার শব্দের মধ্যে অদৃশ্য রুমীর অশ্রুত তির্যক হাসি বাজতে থাকবে। রুমীর সঙ্গে চলবে এই সংগ্রাম চিরটা কাল ধরে! যখন রুমী তার জগৎ থেকে মুছে যাবে, তখনও ঘন যবনিকার আড়াল থেকে সে তার অদৃশ্য শর নিক্ষেপ করে

বিঁধবে শেখরকে, নিজের জয়ে তৃপ্তি বোধ করবে। 'আমি যেমন পাচ্ছি না, তোমাকেও তেমনি দেব না'—এই নীতি রুমীর মধ্যে কাজ করে।

থাক, এসব ভাবনা থাক। এ ভাবনা তাকে অস্থির করে ফেলে। বরং বেরিয়ে পড়া যাক। টোপনের কাছেই যাওয়া যাক।

চন্দনা যদি কাছে থাকত এখন! কিন্তু চন্দনা থাকে না কলকাতায়। আগে থাকত। চলে গেছে। দূরে। আসে মাঝে মাঝে। শেখরের কাছে। কলকাতায় আজ আসবে। চিঠিতে লিখেছে। চিঠিটা আর একবার পড়লে হয়। না থাক। দেরী হয়ে যাবে। তাড়াহুড়ো করে চিঠি পড়া যায় না—চন্দনার চিঠি। চিঠিটা থাক পকেটে।

রাস্তা। ঐ চিঠিটারই সোনালী আভা বোধ হয় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। কী মাস এটা! ভাদ্রের শেষ, অথবা আশ্বিন বোধ হয়। বৃষ্টিধোয়া আকাশের ওপর আশ্বিনের এই পূজো-পূজো রোদটা দেখতে শেখরের ভাল লাগে। বারবার লাগে—সেই ছোটবেলা থেকে। আজও এ রোদ তাকে ছোটবেলার দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। আশ্চর্য প্রসন্ন ছিল দিনগুলো। পূর্ববঙ্গের পাড়াগাঁ, খাল আর জল। মাঠ আর ক্ষেত। অনেক আকাশ, অনেক আগাছা, মাটি আর কাদা। বন্য আর সরল। স্বাস্থ্যবান শৈশব। যুদ্ধপূর্ব বাংলা দেশের শৈশব; যাকে ঘিরে আছে স্মৃতির সোনালী আলো—পূজো পূজো আকাশ-আলো-করা দিন। সোনালী-আলোয় ঘেরা শৈশব—টোপন। রুমীর রং পেয়েছে টোপন। রুমীর এই প্রভাবটা অবশ্য শেখর অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখে না। নিজেকে এই ঠাট্টাটুকু করে শেখর মনে মনে হাসে।

বাস। ভীড়। ঠেলাঠেলি। অন্যদের ছুটি নয়। দু-একটি বাস ছেড়ে দিয়েও সুবিধে হয় না। অন্য একটা রুটে বরং ঘুরে যাওয়া যাক। সময় বেশি লাগবে। তা কিছু করার নেই।

'মাছের দাম দেখেছেন, মশাই। একেবারে আগুন।' বাসের মধ্যে এক ভদ্রলোক উত্তেজিত ভাবে কথা বলছেন।

'মাছ কেন বলছেন শুধু'—আর একজন, 'বাজারে গেসলুম যে। ইলিশ মাছ তা বলে কিনা শালা'—

'ইলিশ তো মশাই ইলিশ। পুঁটি? চিংড়ি? আর কোনটা নয়, তরি-তরকারী? মাংসের দামটাও দিলে চড়িয়ে। গভর্নমেণ্টের যে কী কাজ!'

'গভর্নমেণ্টে তো যে যার কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত। আমাদের আর কে দেখছে।'

'এই বাসের ব্যাপারটা দেখুন না, প্রতি বছর লোকসান যাচ্ছে।'

'আর ভীড়।'

'সময় মত আসে না। আবার এলো তো তিনটে এক সঙ্গে।'

'ইররেগুল্যারিটি, দাই নেম ইজ স্টেট বাস।' টিপ্পনি কাটে একটি তরুণ ছোকরা।

হাসে দুএকজন।

ক্রমে বাসের শব্দে এবং অন্যান্য কথাবার্তায় এ আলোচনাটা চাপা পড়ে যায়। শেখরের কানে আসে বিক্ষিপ্ত কথার এলোমেলো অংশ। চন্দনার চিঠির দু-একটা টুকরো এই সব কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাস চলেছে।

ট্রেন চলেছে। মেয়েদের কামরা। একটা জানালার ধারে আমি বসে আছি। চোখের ওপর দিয়ে দৃশ্যের স্রোত চলেছে। মনের উপর দিয়েও। চোখেও যেমন ঠিক একটা কিছু নির্দিষ্ট ধরা নেই, মনেও তাই। তবে মনের ওপরকার স্রোতের খুব তলায় তুমি রয়েছ প্রধান হয়ে। যে কথাই ভাবি তার আড়ালে আমি তোমার কথাই ভাবছি। যত কিছু ঐ স্রোতের ওপারে ফুটে উঠছে তা তোমাকেই ঘিরে, তোমারই বৃন্তে।

কী যে ভাবছি তার কিছু ঠিক নেই। আসলে কিছু ভাবছি না। আমার মনের খুব ভেতরে তোমায় রেখেছি, ভেতর-মহলের অন্য সব আলো নিভিয়ে দিচ্ছি একে একে। একটা আলো জ্বালা থাক—শুধু তোমার আলো। সেই আলোর গাছতলায় আমি একটু বসি।

আমি ক্লান্ত। আমি খুব ক্লান্ত, শেখর। নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করে করে আমি ক্লান্ত, আহত, দীর্ণ। আমি নিজের হাত থেকেও মুক্তি চাই। ঐ আলোর গাছতলায় আমি আমাকে ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়তে চাই। চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়তে চাই। তরঙ্গহীন আবর্তহীন একটা মন। একটা নিঃশেষে সমর্পণ।

যখন তুমি আমার কাছে থাকো না, তখনও আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি। তুমি জানো না। তুমি শুনতে পাও না। তোমাকে যে আমি আমার ভেতর মহলে বন্ধ করে রেখেছি। ইচ্ছে করলেও তুমি চলে যেতে পারো না। আমি দূরে সরে এলেও আমার ভেতর-মহলের মণিকোঠায় তোমায় আমি চুরি করে নিয়ে আসি। তাই তুমি আমার কাছ থেকে দূরে নও। আমার কাছে, আমার মধ্যে। তোমার যতটুকু আমি জানি তার সঙ্গে আমার ভাল লাগার

রং বুলিয়ে বোধ হয় গড়া এই তুমি ছায়া-শেখর। আমি কথা বলি, সে উত্তর দেয়। সে হাসে। সে আছে। তাকে তুমি ছিনিয়ে নিতে পারো না, আমি বাইরে রাখতে পারি না। আমার সব কাজকর্মের মধ্যেও সর্বত্র সে দাঁড়িয়ে থাকে। আর আমি যখন নিভৃত তখন আমি তোমার মুখোমুখি। তুমি জানো না, তোমাকে চুরি করে রেখেছি তোমার অজ্ঞাতসারে।

কিন্তু নিছক ছায়াতে কি মানুষের চলে? বিশেষত মেয়েদের? অন্তত আমি আমার কথাই ভাবছি, আমার চলে না। ছায়াকে ছাপিয়ে ছায়ার উৎসকে চাই। তাই বার বার আমাকে ছুটে আসতে হয়। নিজেই সরে গেছি, আছি দূরে, হয়তো আছি ঐ ছায়াটিকে নিয়েই। কিন্তু আমি পারি না, তা হয় না দীর্ঘকাল। নিজেকে বঞ্চিত করে, নিজের সঙ্গে লড়ে কতকাল চলে?

এক এক সময় মনে হয়, হাস্যকর এই আত্মবঞ্চনা, এবং হয়তো মূঢ়। কিন্তু—

বৃষ্টি এল। ঘটাঘট শব্দে জানালা বন্ধ হচ্ছে। জানালায় হাত-রাখা আমার ওপর জলের ছাঁট এসে পড়ছে। ঠাণ্ডা। ভাল লাগছে। সেই ছেলেবেলার মত। তখন বৃষ্টি নামলে কী এক খুশী সারা শরীরে শিউরে উঠতো। বাড়ীতে বকুনি খাব জেনেও ভিজতে বেরোতাম।

শরতের বৃষ্টি। আকাশ কাঁপিয়ে আসছে, তবে আকাশ কালো করে নয়। পূজোর আর খুব দেরী নেই। মাসটা ভাদ্রের শেষ, অথবা আশ্বিনের সুরু।

এমন একটা বৃষ্টি-ভেজা অথচ অন্ধকার-নয় দিনে তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছিলে—ঢাকায়। তুমি হয়ত ভুলেই গেছ দিনটা। অথচ তুমি আমার চেয়ে বড়। আমি তখন অত ছোট, তাও মনে রেখেছি আর তুমি হয়তো দিব্যি ভুলে বসে আছ। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমায়, তুমি দিনটাকে অতিকষ্টে স্মরণ করতে

পেরেছিলে, আমাকে বিশেষ নয়। তোমার বেশি মনে আছে খেলার ঘটনা। মোটা-চামড়া পুরুষ মানুষ তুমি জন্ম থেকে। আর বোধহয় চিরটা কাল থাকবেও।

কলকাতা থেকে ঢাকায় ফুটবল খেলতে এসেছিলে তুমি—তোমার কলেজের হয়ে। তখন তুমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়। কচি চেহারা ছিল তোমার। কৈশোর যেতে যেতেও তোমায় ছেড়ে যেতে চাইছিল না। আর আমি তখন কৈশোরের দ্বারপথে। তুমি এলে আমাদের বাড়ীতে—বন্ধুর বাড়ীতে। আমার দাদা ছিল তোমার বন্ধু। দাদার গালে তখন বেশ কড়া দাড়ির আবির্ভাব ঘটেছে। আরো একটু ভারিক্কী চালে চলে—অন্তত আমাদের কাছে। আমরাও সেটুকু ন্যায্য বলেই মনে করি। যে কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে, যে ছুটিতে বাড়ী আসবার সময় ইদানীং একাই ট্রেন-যাত্রা করে, যে দরকার হলে, অথবা দরকার না হলেও, দুটো ইংরেজী কবিতা মুখস্থ শুনিয়ে দিতে পারে, তাকে ভয় ও ভক্তি অনায়াসে করা যায়। এ হেন দাদার বন্ধু। দাদার গুণ তো সবই তার আছে, বাড়তি সে ফুটবল খেলোয়াড়, এবং বাতাবি-পেটা খেলোয়াড় নয়, দস্তুরমত একটা কলকাতার কলেজের এগারো জনের একজন।

তুমি উঠেছিলে তোমার টীমের সঙ্গে অন্য কোথায় যেন। একদিন সন্ধ্যায় এসেছিলে আমাদের বাড়ীতে দেখা করতে এবং নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। বাবা মা দাদা ও দিদি তোমায় এমন ভাবে ঘিরে রাখল যে আমরা অন্ত্যজ হয়ে রইলুম। কদাচিৎ যদিও বা কখনো সন্ত্রস্ত পদক্ষেপে অবরোধ ভেঙেছি, তোমার নজর পড়েনি কারণ তুমি হয়তো তখন অতি-উল্লাসে একটা কর্ণার 'কিকে' তুমি কী ভাবে 'হেড' করেছিলে তার বর্ণনা করছ, অথবা পি, কে, জি, নামক অধ্যাপকের পড়াবার ভঙ্গীটার অনুকৃতি দেখাচ্ছ। হয়তো আমাদের দিকে তাকিয়েছ, দাদা তাচ্ছিল্যভরে আমাদের পরিচয় দিয়েছে, তুমি জিজ্ঞেস করেছ, 'কি নাম, কি পড়?' উত্তরটা বিস্তৃত করে

দেবার চেষ্টায় যখন আমাদের কথা হারিয়ে যাচ্ছে, তখন অকস্মাৎ মা বা বাবা কী একটা প্রশ্নের হ্যাঁচকা টানে তোমাকে সরিয়ে নিলেন আমাদের কাছ থেকে। তুমি আবার ওদের হয়ে গেলে, যেমন ঠিক একটু আগে ছিলে।

সব কথা ভাল করে মনে নেই। মনে আছে সেই ঘরটা। ঐটেই ছিল আমাদের বাড়ির প্রধান ঘর। ও ঘরে আমাদের অনেক কিছু ঘটেছে। ও ঘরেই দাদা আর বাবা—সে থাক। তুমিও ঐ ঘরেই বসেছিলে, যতক্ষণ ছিলে।

তুমি তো বেশ ভুলে বসে আছো সব। বেশ লোক বাপু।

লোকটির এখন কী করা হচ্ছে? ইউনিয়ন অফিসে বসে 'দেশোদ্ধার' করা হচ্ছে? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর অভ্যেস তো লোকের একটু বয়স হলেই কেটে যায় বলে শুনেছি। ও অভ্যেস তো আমায়ও ধরেছিল। এত রোগের টীকে বেরোল, এর কিছু বেরোল না, আশ্চর্য! এ বয়স পেরিয়েও যাদের এ-রোগ থাকে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা নেতা বা নেতাপদ প্রার্থী। আর যারা এ দুটোর কোনটাই নয়, তাদের এ রোগ মরণ-কামড় দিয়েছে। তুমি এই শেষের দলে। তোমার আরো দু-চারজন বন্ধু আছে এমনি। এদের মরণ ঠেকানোর সাধ্য কারো নেই। বাজে কথা থাক। কী করছ এখন? লিখছ-টিখছ কিছু আজকাল? না কি ওটা শিকেয় তুলে রেখে দিয়েছ? আর সেই রিসার্চ?

বৃষ্টি আমাকে আলতো করে একটু ভিজিয়ে—যেন আদর করে —এই মাত্র চলে গেল। ঐ যাচ্ছে বৃষ্টিটা একটা বড় মাঠের ওপর দিয়ে—লিকলিকে লম্বা পা ফেলে ফেলে, দল বেঁধে, সমস্বরে গান গাইতে গাইতে। চলে যাচ্ছে বৃষ্টি-মেয়েগুলো দূরে, অতীতের অনেকগুলো চন্দনার মত, বয়স তাদের বারো-চোদ্দ থেকে আটাশ-ত্রিশ। কী উচ্ছল দ্রুত গতিতে ওরা যাচ্ছে। এরই মধ্যে এত দূরে ওরা চলে গেছে যে ওদের গান আর শুনতে পাচ্ছি না, তবু আবছা

ভাবে ওদের নাচের মত সাবলীল চলা দেখতে পাচ্ছি, আর ওদের আদরের মিষ্টি ছোঁয়া পাচ্ছি আমার হাতে।

দশ থেকে ত্রিশ বছরের—চন্দনারা ছুটে চলে গেল। মঞ্চ থেকে দ্রুত প্রস্থান। এবার তিরিশের চন্দনা—ভাঙ্গা-ছেঁড়া-খোঁড়া চন্দনা—এবার তোমার প্রবেশ। হ্যাঁ, ঢুকব।

মঞ্চের মধ্যে যে লোকটার দাঁড়িয়ে থাকবার কথা, তাকে দেখতে পাচ্ছি না যে! সে কোথায়? কী করছে সে এখন!

'টোপন কোথায় ?'

'ভেতরে।' বলল রুমী।

'কি করছে ?'

'পড়ছে। গল্পের বই। বোধহয়।'

ছুজনেই চুপ করে রইল একটুক্ষণ।

'ডাকব ?' জিজ্ঞেস করল রুমী।

চটছিল শেখর। বলল, 'যা ভাল বোঝো।'

'ভাল-বোঝাবুঝির কিছু নেই। আমার কথাটা সেরে নেবো আগে ? নাকি টোপনকে ডাকব ?'

'বল। কি বলছ ?'

'আমি বাইরে চলে যাব ভাবছি।'

'কেন ?' শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করল শেখর। 'কি জন্যে যাচ্ছ ? কি দরকার ?'

'দরকার ঠিক কিছু নয়। ভাল লাগছে না। কোলকাতা আমার ভাল লাগে না। অন্তত এখন লাগছে না। তাই ভাবছি—'

'কোথায় যাবে ?'

'দিল্লী।'

'সে তো অনেক দূর।'

'হ্যাঁ, দিল্লী অনেক দূর।' একটু যেন ঠাট্টাই করল রুমী।

'দিল্লী চলে যাবে তুমি ! কবে যাচ্ছ ?'

'আজ।'

'আজ ?'

'না, না ! আজ যাব। ওখানে ইণ্টারভিউ আছে। সেটা দেব।'

'ইণ্টারভিউতে হবেই ভাবছ কেন ?'

'হোক তুমি এটা চাও না হয়তো—মনে হচ্ছে তোমার কথা শুনে।'

'না, তা নয়। তোমার যদি চাকরির উন্নতি হয়, আমি বাধা দেবার কে ? কিন্তু ইণ্টারভিউ দিলেই তো চাকরী হয় না।'

'তা হয় না, তবে আমার এক বন্ধু আছে ঐ কলেজেই। সে একটু ভরসা দিয়েছে।'

'এখানের চাকরীও তো তোমার খারাপ ছিল না।'

'এখানকার থেকে দিল্লীতে মাইনে বেশি।'

'খরচও বেশি। যতদূর শুনেছি।'

'সে খরচ পুষিয়েও বেশি।'

'সে সামান্য। কিন্তু কোলকাতায় অন্য সুবিধেও আছে।'

'কি সুবিধে—যা দিল্লীতে পাওয়া যায় না ?'

'আমি মেটেরিয়াল সুবিধের কথা বলছি না। এখানে আত্মীয়-স্বজন, লোকজন—'

'লোকজনের সঙ্গে আমায় কোন সম্পর্ক নেই।'

'তবু হয়তো এখানে কিছুটা আছে।'

'বিন্দুমাত্র নেই। আমি একা এখানেও, ওখানেও।' একটু থেমে বোধহয় একটু বাঁকা হেসে বলল, 'এ রকম কথা শুনলে লোক বিয়ে করবার পরামর্শ দেয়, কিন্তু আমার পক্ষে সেটাও সম্ভব নয়।'

'অসম্ভব কী। তুমি বিয়ে তো করতে পার। তোমার চেহারা, বয়স—'

'আস্তে, আস্তে। টোপন শুনে ফেললে লজ্জা পাব।' যোগ করল, 'বিয়ের স্বাদ কি মেটে নি—আমার কথা বলছি।'

'তা কেন ? আরো ভাল লোক, তোমার পক্ষে স্যুটেবল্—'

'বিয়ের ব্যাপারটায় খুব সিরিয়াস দেখছি। বিয়ে করছ নাকি শিগগির ? ভাংচি দেবো না।'

'সময় সুযোগ পেলে করব। মিসোজিনিস্ট নই।'

'কে পাত্রীটি? নিছক মেয়েলি কৌতূহল। ব্যক্তিগত কিছু নয়।'

'থাক এ সব কথা।'

'কে? চন্দনা নাকি?'

'আমি এসব কথা আলোচনা করতে চাই না।'

রুমী হাসল বেশ জোরেই।

'তোমাকে চটানো খুব সহজ। ঠিক আগের মতই।'

শেখর চটছিল ঠিকই। কিন্তু টোপনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ভেতরে ভেতরে তার সারাটা মন উন্মুখ হয়ে ছিল। তার ওপর ঐ দিল্লীর খবর। এর অর্থ টোপনের সঙ্গে এই ক্ষীণ সম্পর্কটুকুও আপাতত থাকবে না, টোপনকে রুমী দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। তার ওপর অত্যাচার করে রুমীর কি লাভ? রুমী শেখরের অন্য যে কোন ব্যাপারে নিস্পৃহ। শুধু এইখানটায় ঘা দিতে চায় কেন?

শেখর বলল, 'তুমি এত একা কেন? টোপন তো রয়েছে।'

'টোপনকে তো তুমি একদিন নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু এখন তার জন্যে একা থাকবে কেন?'

'একা আমি থাকবই। তুমিই তো একদিন বলেছিলে, আমার ব্যক্তিক কৌণিকতা অত্যন্ত বেশী। এবং সেটাও নাকি, তোমার ভাষায়, যুগপ্রভাব-জাত। বাব্বাঃ, কী যে শক্ত শক্ত ভাষায় কথা বলতে তখন তুমি। এখনও বল নাকি ঐরকম? নিছক মেয়েলি কৌতূহল।'

রুমী এত উচ্ছলভাবে শেখরের সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু আজ বোধহয় সে খুশীটাকে চোখের ওপর তুলে ধরে দেখাতে চায়। অন্যদিন সে নিস্পৃহ কণ্ঠে দুটো-একটা প্রশ্ন করে; সেটা আসলে উপস্থিত থেকে পিতা-পুত্রের ওপর পাহারা দেবার জন্য। শেখরের

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আলোচনাতে রুমী কখনও আগ্রহ দেখায় না। আজ আলাদা।

রুমী আবার আরম্ভ করল, 'সত্যি, তোমায় দেখলে মাঝে মাঝে আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই। আইডিয়ালিজম্-এর শূন্য বাতাসে ভেসে ভেসে কম দিন কাটালে না তুমি। বই পড়ে আর বই লিখে চিরকাল বইয়ের জগতে কাটিয়ে দিলে। যে কোন জিনিষকে একটা থিয়োরীর খাঁচায় পোরার কী অদম্য আগ্রহ। নতুন দাঁতের মত থিয়োরীটা যার নতুন গজিয়েছে সে এরকম করতে পারে। কিন্তু তুমি জেনে রেখো যে একা থাকতে আমার বেশ লাগে। একলা না থাকতে পেলেই বরং অসুবিধে বোধ করি।'

'টোপনকে তো তোমার দরকার নেই তাহলে, তুমি যদি একলা থাকতে ভালবাসো।'

'আঃ, টোপনের কথা আসছে কি করে এর মধ্যে ?'

আবার দুজনে চুপচাপ। অস্বস্তি ও বিরক্তি লাগছিল শেখরের এইভাবে বসে থাকতে। আর টোপনকে যেন গুম করে রাখা হয়েছে। আজকেই আবার নিয়ে যাওয়া হবে। নিস্ফল ক্রোধে সে ভেতরে জ্বলতে লাগল। টোপনকে ছেড়ে থাকতে হবে ভেবে কষ্টও হচ্ছে। কাজের ভীড়ে দম বন্ধ হয়ে যাবার সময় হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে আসা টোপনের কাছে—এই মুক্তি থেকে সে বঞ্চিত হয়ে থাকবে।

তাছাড়া, রুমীর হাতে টোপনকে পুরো ছেড়ে দিতে তার মন সায় দেয় না। রুমীকে সে দায়িত্বজ্ঞানহীন মনে করে। সন্তান-পালনের দায়িত্ব পুরো নেবার ক্ষমতা নেই তার। এখনও টোপন রুমীর হাতে অবশ্য। কিন্তু প্রতিনিয়ত শেখরের চোখ আছে। এই চোখটা সে সরাতে চায় না। এখনও বহু খুঁটিনাটি ব্যাপারে শেখরের সঙ্গে রুমীর মতবিরোধ ঘটে—সন্তানপালনের ক্ষেত্রে উভয়ের মত আলাদা। শেখর তার মতটা বলে—নিতান্ত অসহ্য হলে। কিন্তু জোর করে না।

সে জানে, যত সে জোর করবে, তত রুমী তার উলটোটা করবে, তাকে পরাজিত করে তার বিকৃত এক আনন্দ আছে।

কয়েক বছর পরে যে রুমীর কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না টোপনের ওপরে, এখন সে তাই সুদে-আসলে উসুল করে নিচ্ছে যেন। শেখরের তিক্ত লাগে এই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ দ্বন্দ্ব—বিশেষ করে টোপনকে কেন্দ্র করে। ওর আশঙ্কা বাপ-মার এই দ্বন্দ্ব টোপনের ক্ষতি করে ফেলতে পারে।

টোপনকে দূরে সরিয়ে নিলে তার মনে শেখরের কোন ছাপ থাকবে না। যতটুকু এবং যেমন ছাপ রুমী তার মনে ফেলতে চাইবে, তাই হয়ে যাবে শেখর টোপনের কাছে। সে চেষ্টা—শেখর সম্বন্ধে সত্য গোপন ও বিকৃতির উপস্থাপন—চলে হয়তো সূক্ষ্মভাবে। তাকে প্রতি মুহূর্তে রোখবার চেষ্টা করতে পারে শেখর। কিন্তু দিল্লীতে চলে গেলে— !

'তোমার না গেলেই নয়?' হতাশায় প্রায়-করুণ শোনাল শেখরের গলা।

রুমী ঐ গলাটা শুনেই বোধহয় একটু স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমি যাচ্ছি ইণ্টারভিউ দিতে! যতদূর সম্ভব আমি ফিরেই আসব। একটু বেড়ানো হবে কয়েকদিন—এই মাত্র। কেন এ ঘটনাকে তুমি এত বড় করে দেখছ।'

সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও একটু আশ্বস্ত হলো শেখর। বলল, 'আজই যাবে?'

'আজ না গেলে ইণ্টারভিউ দেওয়া যাবে না।'

'কখন গাড়ী? কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম?'

হঠাৎ টোপন ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকল। শেখরকে দেখে থমকে দাঁড়াল: 'বাবা তুমি!' ছুটে এলো শেখরের কোলে। 'তুমি কখন এলে?'

শেখর ওকে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'অনেকক্ষণ।'

ঘাড়টা পেছনে সরিয়ে শেখরের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমায় ডাকো নি যে!'

'ডাকছি তো—সেই কখন থেকে। টোপ—ন, টোপ—ন। টোপন শুনতেই পায় না, তা আমি কী ক'ব!'

'ডেকেছো আমায়?' চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল।

'অনেকবার।'

'শুনতে পাই নি।'

'কি করছিলে তুমি? এত ঘেমেছো কেন?'

'ঘোড়ায় চাপছিলুম।'

'ঘোড়া!'

'হ্যাঁ, তুমিই তো দিয়েছিলে, বারে! গেলবার জন্মদিনে।'

'ও তাই তো।' শেখরের মনে পড়ল রকিং হর্সটার কথা। সঙ্গে সঙ্গে লরেন্স-এর 'রকিং হর্স উইনার' গল্পটার কথাও মনে পড়ল—তার প্রিয় গল্প। টোপন ও পল মুহূর্তের জন্যে মিশে গেল। একটা কাঠের ঘোড়া অনড় কাঠামোর মধ্যে ছুটছে। সওয়ার একটি শিশু। পল বা টোপন। পল ও টোপন একাধারে। ছুটছে ঘোড়াটা, ছুটছে। 'মালাবার, মালাবার।'

'দিল্লী, দিল্লী, আমরা দিল্লী যাব বাবা।'

'দিল্লী! সে আবার কোথায়?'

'অনেক দূর। তুমি যাবে বাবা আমাদের সঙ্গে?'

'যাব?' থমকে গেল শেখর। 'সে যে অনেক দূর বাবা। আমি যাব কেমন করে অত দূর?

'কেন? আমাদের সঙ্গে?'

'তুই আমায় তোর সঙ্গে নিবি?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় পুরোটা কাৎ করে ফেলল টোপন। 'তুমি যাবে তাহলে—কী মজা! দিল্লীতে রেলগাড়ীতে চড়ে যেতে হয়, জানো?'

'না, জানি না তো।'

37417
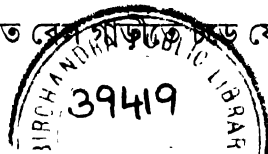
'তুমি কিছু জানো না।'

রুমী দেখছে ওদের। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এই দৃষ্টির সামনে শেখর অস্বস্তি বোধ করে, আড়ষ্ট হয়ে যায়। এখন রুমী স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে এখান থেকে। কোথাও রাজ-আদেশ নেই পাহারার। তবু থাকে। থাকলই বা! এইতে শেখরের এত অসুবিধে কেন? একটু ভাল করে আদর করলেই তো হয়! হয়, কিন্তু আজ অবধি হলো না। 'প্রাইভেসি' ক্ষুণ্ণ হয়? কথাটা শুনলে রুমী হাসবে।

'বাবা, তুমি সত্যি যাবে তো?'

'তুই নিয়ে গেলেই যাব।'

'হ্যাঁ, আমি তো নিয়েই যাব। মা বলছিল—তুমি যাবে না।'

থমকে গিয়ে শেখর চোখ তুলল রুমীর দিকে।

রুমীর চোখ নামানো উচিৎ ছিল—শেখর মনে করে। কিন্তু সে অপলক তাকিয়ে রইল—শেখরেরই দিকে। লজ্জা বোধ করল না। অপরাধ মনে করছিল না তার কাজকে। অবশ্য অপরাধই বা কী। সে তো সত্যি কথাই বলেছে। রুমী তার দিকে তাকিয়ে আছে। শেখরের প্রথমে মনে হয়েছিল, রুমী উপভোগ করছে পরিস্থিতিটা। এখন মনে হলো রুমী কিছু ভাবছে না, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাত্র। তার চোখ শেখরের দিকে, কিন্তু সে দেখছে না তাকে, বা অন্য কিছুকে।

শেখরের চোখে যে ভৎর্সনার দৃষ্টিটা ঘনিয়ে উঠেছিল, তা বিড়ম্বিত হয়ে গেল।

'না, আমি যাব না টোপন।'

'কেন, যাবে না কেন?' নাকি-কান্নার সুরে আদুরে গলায় বলল টোপন।

'কাজ রয়েছে বাবা আমার।'

'উঁ—তোমার খালি কাজ।'

'তোমরা আবার চলে আসবে—দু-একদিন বাদে।'

'তার মানে তুমি আমার কাজ হোক তা চাও না।' হেসে বলল রুমী।

চুপ করে রইল শেখর।

'কথা বলছ না যে।' বলল রুমী।

'ওখানে হোক তা চাই না—তা তুমি জানো।'

'আমি দুটো টাকা রোজগার করি, টোপনকে আর একটু ভাল-ভাবে রাখি—তা তুমি চাও না?'

'ও দুটোকে অমন এক করে জড়িয়ে দিয়ো না। তুমি টাকা আরো বেশি রোজগার করলে আমার আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে! এখানে থেকে কর না।'

'এখানে কলেজের অধ্যাপকদের কত দেয় তা তুমি জানো না?'

'কম দেয়। কিন্তু তোমার খরচ তো কম।'

'কমবেশিটা স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং-এর ওপর নির্ভর করে। আমার এতে চলে না।'

'টোপনের খরচ তো আমি দিতে চেয়েছিলাম, তুমি নাও নি।'

'না। সে আমি নেব না।'

'তুমি ভুল করছ। এটা তুমি নিচ্ছ না। নিচ্ছে টোপন।'

'ও যুক্তি জানি। আমি নেব না বলেছি তো।' বেশ জোরেই বলল রুমী। চীৎকারের মতই শোনাল সেটা।

টোপন বিস্মিত চোখে দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। সব সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

'টোপন, ভেতরে গিয়ে দিদাকে বল আমায় চা দিতে।' বলল শেখর।

টোপন ধীরে চলে গেল।

'টোপনের সামনে চীৎকার করো কেন?'

'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না বলে।'

'না, না। বাপ-মার ঝগড়া দেখে ও কী ভাববে। ও বড় হয়ে তো আমাদের কাউকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না।'

'সে এমনিই পারবে না।'

'না, না। টোপনের চোখের সামনে ঝগড়া—'

'চোখের সামনে না করলেও জানতে পারবে। ডিভোর্স কেউ প্রেমবশে করে না, এ জ্ঞান ওরও হয়ে যাবে বড় হলে।'

'না, আমি পছন্দ করি না।'

'তোমার পছন্দ মত রেখো যখন তোমার কাছে থাকবে ও।'

'রুমী—'

থেমে গেল শেখর। চীৎকার করেই উঠেছিল সে, কিন্তু থাক। পরের বাড়ীতে একটা কেলেঙ্কারী করবে না সে। কারণ চীৎকারের বিনিময়ে চীৎকার দিতে কার্পণ্য করবে না রুমী।

শেখরের মনে পড়ল, একদিন তারা ঝগড়া করেছিল এই বাড়ীতে' —মাত্র অল্প কিছু দিন আগে, টোপনের সামনে। বাড়ীর অন্যান্য লোকেরাও হয় তো শুনেছে, কিন্তু শালীনতাবশত ঘরে ঢোকে নি।

রুমী টোপনকে রাখছে ব্যয়বহুলতা ও বিলাসিতার মধ্যে। এটা শেখরের পছন্দ নয়। শেখর চায় সাদাসিধে সরল অনাড়ম্বর পরিশ্রমী জীবন। এ সম্বন্ধে তার প্রায় একটা থিয়োরিই আছে। রুমী সে থিয়োরিকে মনে করে উদ্ভট। এই নিয়ে বচসা।

রুমী হঠাৎ বলেছিল, 'দ্যাখো, মজুর-উদ্ধার ব্রতের যা কিছু একস্‌পেরিমেন্ট, তা নিজের ওপর কর, ছেলের ওপর ঐ সব ফলাতে এসো না। আমার ছেলে মজুর নয়।'

শেখরও চটে গিয়েছিল, 'ওসব বাজে কথা রাখো। যেমন ভাবে চিরকাল তাকে থাকতে হবে, সেই ভাবেই তাকে রাখো।'

'ছেলেকে ভালভাবে খাইয়ে পরিয়ে রাখা যে কোন বাপের কর্তব্য। কৃচ্ছ্রতাসাধনের ব্রত আসলে অক্ষমতার আবরণ।'

আশ্চর্য। এই রুমীই একদিন মনে করত যে শেখর

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের পরীক্ষাটা দিলেই সার্ভিস পাবে—বসার যা অপেক্ষা।

'কৃচ্ছ্রতাসাধন এ যুগে নপুংসকের ধর্ম।' রুমী কি রকম যেন ক্ষেপে গিয়ে দংশন করছিল ঐ যায়গাটাতে।

'আমিও মানি সে-কথা। কিন্তু বিলাসিতাকেও আমি ঘৃণা করি।'

'বিলাসিতা তুমি কাকে বল জানি না। প্রাচুর্যের মধ্যেই শিশুকে মানুষ করব আমি। তার যেন নিশ্বাসে কষ্ট না হয়, সে যেন হাত পা ছড়িয়ে মানুষের মত বাঁচে। নোংরার মধ্যে নয়, বদ্ধ হাওয়ার মধ্যে নয়।'

'এ ভাল কথা। কিন্তু তুমি এর চেয়ে বেশি করছ।'

'না, না, না। করছি না।' চীৎকার করে উঠল রুমী। মাঝে মাঝে কী রকম হিস্টিরিয়ায় ধরে যায় যেন রুমীকে। তখন শেখরকে কিছু বলতে হয় না, সে আপনা থেকেই ফেনিয়ে তোলে তার বিষ-উদ্‌গার।

সেই দৃশ্যের পুনরভিনয় চায় না শেখর। ঐ দিন ঝগড়া করেই পরে তার লজ্জা হয়েছিল। ডিভোর্সের থেকেও কুৎসিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্যাপারটা। ডিভোর্সে তবু একটা যুক্তি আছে—বনল না। এটা বাইরের দিক থেকে অন্তত গোটা কত সইয়ের ব্যাপার। পরিষ্কার, নির্ঝঞ্ঝাট। আর ওরা দুজনে যখন চীৎকার করে টোপনের সামনে ঝগড়া করে তখন ক্লেদটা যেন দৃশ্যমান হয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। উত্তেজনায় সেই মুহূর্তে বোঝা যায় না। পরে বোঝা যায়—সেই ক্লেদের ছোপ লেগে থাকে এখানে-ওখানে, অনেক দিবারাত্রির স্রোতে তবে সে মোছে। সেই ছোপছাপওয়ালা চেহারার দিকে তাকালে চেনা যায় না যে রুমী একটা কলেজের অধ্যাপিকা আর শেখর একজন—কী? রাজনৈতিক কর্মী? সাহিত্যিক? অধ্যাপক বা আই, এ, এস, হতে হতে স্বেচ্ছাবঞ্চিত? অর্থাৎ মনেই হয় না যে সে একজন ভদ্রলোক। তাকে দু-দশটা

চটকল-মজুর ইউনিয়নের কর্মী বলে মানে, বোধহয় একটু সমীহই করে ; চন্দনার তার সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা। এ হেন শেখর ঐ ছোপছাপগুলোর দিকে তাকিয়ে বিব্রত বোধ করেছে অনেক দিন—যেন তার ভেতরের কোন চাপা দূষিত ব্যাধি হঠাৎ ফুটে বেরিয়েছে। চন্দনাকে অবশ্য বলেছিল সে ঘটনাটা। চন্দনা নীরব-মমতায় শুধু তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে ; শেখরের ধারণা সে-দৃষ্টি তার প্রাপ্য নয়। আর একটু কঠিন কিছু না হলে ছোপছাপ-গুলো উঠবে কি করে।

সেদিন কুৎসিত ভাষায় তারা ঝগড়া করে সবাইকে – নিজেদেরও —তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। আজ আবার সে খেল দেখাবে না।

সে একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। নিজেকে সামলে গুছিয়ে নেবার জন্য।

তারপর বলল, 'আমি উঠি।'

'বসো। টোপনকে যে চা-র কথা বললে—'

তুজনেই দরজার দিকে তাকাল। সেখানে টোপন দরজার একটা পাল্লার আড়ালে ঈষৎ ভয়ার্ত চোখে দাঁড়িয়ে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে—ওখানে ও দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ। দিদিমাকে চা-র কথা বলেই হয়তো ও ফিরেছে, তারপর দরজার কাছেই থেমে গেছে।

শেখর ডাকল, 'টোপন।'

একটু ভয়ে ভয়েই যেন টোপন কাছে এগিয়ে এল, শেখর ওকে কাছে টেনে নিল।

'টোপন, দিদা কি বলল ?'

'দিচ্ছে।'

'দিদাকে গিয়ে বল, বাবার একটু তাড়া আছে, চা-র দরকার নেই।'

'নাটক করো না।'

'টোপন, দিদাকে গিয়ে বল একটু তাড়াতাড়ি করতে।'

টোপন চলে গেল।

'রুমী, আমি তো বলেছি, টোপনের সামনে তোমার ঐ ভঙ্গীতে কথা বলা আমার ভাল লাগে না। নাটক করা আমি পছন্দ করি না। কিন্তু আমার—'

'—বিশ্রী লাগছে।' শেখরের ঠিক মুখের কথাটি কেড়ে যেন উচ্চারণ করল রুমী।

শেখরকে একটা ঢোঁক গিলে মিথ্যে কথাটা বলতে হলো, 'আমার কাজ আছে।'

'কাজ চা হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে পারবে।'

শেখর চুপ করে রইল। বিশ্রী লাগছে এভাবে রুমীর মুখোমুখি বসে থাকতে। কথা নেই কিছু—এতক্ষণ কথার একটা আড়াল ছিল। কিছু কাজ নেই করবার। বইয়ের পাতাটা ওলটানো যায়, পড়তে বসে যাওয়া যায় না।

টোপন এলে এ অবস্থাটা পালটাত। কিন্তু টোপন বাতাসে কী যেন শুঁকে দূরে সরে গেছে। আসছে না। আসবার সময় হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। এ বাড়ীর অন্দরমহলের মানচিত্র তার অজানা নয়।

না, টোপন আসবে না। ও হয়তো এখন সেই রকিং হর্সটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটু অন্যমনস্ক হয়ে। এখন হয়তো ঐ আনমনাভাবেই চাপল ঘোড়াটায়। বসে রইল। তারপর কোন সময় হয়তো দুলতে আরম্ভ করেছে—নিজের অজ্ঞাতসারেই। গতি বাড়ছে ক্রমে। বিষণ্ণ আত্মসমাহিত মাস্টার পল্। ছুটছে রেসের ঘোড়া। লাক্। লাকী হতে হবে তাকে। লাক্ তার লক্ষ্য। 'মালাবার মালাবার।' ঘোড়াটা ছুটছে।

"'তুমি টোপনকে সব কিছু থেকে আড়াল করে রাখতে চাও, তা-ই না?'

'খুব স্বাভাবিক সেটা।'

'ইচ্ছেটা খুবই স্বাভাবিক। কাজটা একেবারেই অসম্ভব।'

'কেন, অসম্ভব কেন ?'

'দু-চার দিনের মধ্যেই ওকে স্কুলে শুনতে হবে ওর বাপ-মার কেচ্ছা। আমি-তুমি 'কেচ্ছা' না মনে করতে পারি। এদেশের বেশির ভাগ লোক তাই মনে করবে। এমন কি শিক্ষকদের মধ্যেও এ আলোচনা হবে এবং হয়।'

'এ হওয়া উচিৎ নয়।'

'ইন্‌করিজিব্‌ল্‌ !' হতাশার মুখভঙ্গি করল রুমী। 'আইডিয়ালিজমের চূড়ায় বসে ঔচিত্যের হিসেব তুমি করে যাও, যারা বলবার তারা বলে যাবে। সুতরাং আমি সব দিক খুলে দিতে চাই। সব আসুক, তারপর ওর যা নেবার নিক।'

'না, এত অল্প বয়সে কিছু নিষেধ থাকা দরকার। ওর এখনও বাছবার ক্ষমতা হয় নি।'

'সে ক্ষমতা হবার আগেই ওর কাছে সব এসে যাবে, তুমি ঠেকাতে পারবে না।'

'যতটা পারি।'

হাসল রুমী। বাঁকা হাসি। বলল, 'তুমি বাইরে তো দূরের কথা, নিজের বাড়ীতে ঠেকাতে পারবে ? যখন টোপন তোমার কাছে গিয়ে পাকাপাকি থাকবে, তখন সে ক্রমে জানবে ও বিশ্বাস করবে যে তার মা ছিল একজন খুব খারাপ চরিত্রের লোক। তুমি ঠেকাতে পারবে তা?'

'আমি তো ঐ সব কথা কোন দিন বলবই না।'

'তোমাকে বলতে হবে না। তোমার আশপাশে এ কথা এত কণ্ঠে ধ্বনিত হবে যে তাকে চাপা দেওয়ার সাধ্য তোমার সদিচ্ছার নেই।'

ভেবে দেখলে কথাটায় সত্যতা আছে। এ দিকটা অবশ্য শেখর কোনদিন ভাবে নি।

আর সে ভাবতে পারে না। ভাবতে চায় না। এখন একবার টোপনটা ছুটতে ছুটতে যদি আসত, সব ভাবনা-চিন্তা ডুবিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে আসছে না।

'কি ভাবছ ?' জানতে চায় রুমী।

'একটা কথা বলব ?'

'কি ভাগ্যি আমার ? বল।'

'খুব ব্যক্তিগত। তা হলেও বলছি। যতদূর শুনেছি, অসীম বোস তোমাকে ভালবাসে, ওকে বিয়ে করে—'

'বিয়ে করব কী করে ?'

'কেন ? অসীম তোমাকে ভালবাসে।'

'আমি বাসি না। এবং ভালবাসা বলে কোন বস্তু পৃথিবীতে আছে কিনা তাতে সংশয় পোষণ করি। দৈহিক তৃপ্তি, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা ইত্যাদি বুঝি, কিন্তু ভালবাসা—'নেতিবাচক ঘাড় নড়িল রুমী। 'সুতরাং বিয়ে করা মুস্কিল। একদিন যদি ঐ দাবীর কোনটা অতিরিক্ত পীড়ন করে, তবে ভেবে দেখব। এখনও আমি অতটা দুর্বল নই।'

একটু চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ল শেখর। ওঠবার মুখে রুমী বলেছিল, 'টোপনের সঙ্গে দেখা করে যাবে না ?'

'না থাক। ও হয়তো খেলছে।' একটা প্রতিবাদ হিসেবে বলল শেখর। টোপনের সামনে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যবহার করেছে রুমী। দ্বিতীয়ত, শেখর টোপনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে তার পাওয়াটা অসম্পূর্ণ করে দেয় রুমী। এই দুয়েরই নীরব ও পরোক্ষ প্রতিবাদ করে শেখর বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তা। ভাল লাগল। ফাঁকায় এসে দাঁড়িয়েছে একটু। বিশ্রী হাওয়াটা রয়ে গেছে ঘরে। ওখানে টোপন থাকবে। এখনও কয়েক বছর। আসবার সময় টোপনকে আদর করে আসা হয় নি আজ। সেই তৃষ্ণার পরিমাপটা এখন সে করতে পারল। রুমীর সামনে এ তৃষ্ণাটাও যেন সংকুচিত হয়ে থাকে। এখন সেটা ধীরে ধীরে প্রসরিত হয়ে তার স্বরূপ প্রকাশ করছে।

রুমীদের বাড়ীটা মিলিয়ে গেল মোড়ের বাঁকে ? একটা কাজ

মাথায় নিয়েই বেরিয়েছে সে। কান্তি আর সুবর্ণা। ওদের 'পুনর্মিলন'। বিয়ে করে কয়েক বছর সুখেই—অন্তত বাইরে থেকে দেখতে সুখেই—ছিল ওরা। তারপর বিগড়ে গেল যন্তরটা, তারগুলো জট পাকিয়ে গেল। সুর বাজতে লাগল বেসুরো। সেটা শেষে এমন মাত্রায় দাঁড়াল যে আলাদা থাকা ছাড়া কোনো উপায় রইল না। যে যার পথে যেতে চায়। যে যার পথে বেশ যাচ্ছিলও। সুবর্ণা আরম্ভ করল বি, টি, পড়তে। আর কান্তি চাকরীর বৃহত্তর সিংহদ্বার খোলবার সাধনায় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার তোড়জোড় করতে লাগল। দুজনে পরীক্ষার বেড়া ডিঙ্গিয়েও গেল; ইতিমধ্যে বছর তিনেক কেটে গেছে। শোনা যাচ্ছিল, আদালতের সাহায্যে বিচ্ছেদটা এবার আইনী হবে। লোকে তাদের অন্য নারী এবং পুরুষের সঙ্গে ভবিষ্যৎ বন্ধনের সূচনাও নাকি দেখতে পাচ্ছিল। অনেকে হলফ করে একটি নারী ও একটি পুরুষের নাম ঘোষণা করল—যারা তখন যথাক্রমে কান্তি সুবর্ণার নাকি সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ। বন্ধুরা যখন বিচ্ছেদ-উত্তর এক জোড়া বিয়ের কথা ভাবছে, তখন একদিন কে যেন বলল, কান্তি আর সুবর্ণা এক আধ সময় দেখা করছে। খবরটা প্রথমে কোনো বিশেষ পাত্তা পেল না। পরে যখন একই খবর বিভিন্ন সূত্রে শোনা গেল, তখন কিঞ্চিৎ কান না দিয়ে আর উপায় রইল না। ওরা দেখা করছিল—গোপনে। লোকের সামনে পড়তে তাদের নিজেদেরই লজ্জা করছিল। নতুন করে প্রণয়—একই নারীর সঙ্গে। একই নারীকে দুবার আবিষ্কার। এক নারীতে দুবার রোমান্স। এটারই নাম দিয়েছে বন্ধুরা—'পুনর্মিলন'।

বেশ আশ্চর্যই লাগে শেখরের। এবং একটু মজাও। এমন কি তার কৌতুক-উজ্জ্বল অংশটা তাকেই প্রশ্ন করে, 'কি, রুমীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার রোমান্স-এর একটা চেষ্টা করে দেখবে নাকি।'

'রক্ষে কর।' উত্তর দিল তার অন্য অংশ।

'চেষ্টা করেই দেখ না। এক নারীকে দুবার আবিষ্কার! বেশ ইণ্টারেস্টিং নয়?'

'একবারেই যথেষ্ট ইণ্টারেস্ট পেয়েছি। ধন্যবাদ।'

কান্তি সুবর্ণার সম্পর্কটা শেখরদের মত করে ভাঙ্গে নি বোধহয়। শেখর জানে—তাদের 'পুনর্মিলন' কী রকম অসম্ভব! যদি সে-সম্ভাবনা থাকত, তাহলে সম্পর্ক ভাঙ্গত না। শেখর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। সম্পর্কটার যেদিকে যতটুকু সম্ভাবনার সূত্র আছে বলে তার মনে হয়েছিল, সেখানেই সে হাতড়ে দেখেছিল। কিন্তু তেমন কিছু খুঁজে পায় নি শেখর। যত পেত না, তত তার ঝোঁক চেপে যেত। এটাকে তার একটা পরাজয় বলে মনে হতো। সম্পর্কটা যখন গড়ে উঠেছিল, তখন চিরদিনের মতই ভাবা ছিল তার। যখন সেটা ভাঙ্গতে লাগলো, তখন একটা ব্যর্থতার চেতনাও তাকে পীড়া দিত। এটা এমন হওয়া উচিৎ ছিল না। ভাঙ্গা উচিৎ নয় সম্পর্কটা, এটাকে অটুট রাখবার ক্ষমতা থাকা উচিৎ ছিল। কিন্তু তার আয়ত্তাতীত বহু ঘটনা আছে। স্বয়ং রুমীই তখন হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে। সে নাকি বহু আশা করে এসেছিল। শেখর তাকে কোনদিন আশা করতে বলে নি। বরং তার চালচলন দেখে রুমীর আগেই বোঝা উচিৎ ছিল। হয়তো রুমীরও তখন প্রথম যৌবন—শেখরেরই মত। শেখরও তো ভুল করেছিল। আশাও নিশ্চয়ই করেছিল। প্রথম যৌবনের রঙ্গীন চশমা তখন উভয়েরই চোখে। সবেগে তারা দুজনে দুজনের দিকে ছুটে গেল—আশ্লেষ-আঘাতে চুরমার হবার জন্যেই। রুমীর ধারণা ছিল, রাজনীতি ও সাহিত্যের বাতিক বিয়ের অব্যবহিত পরেই মরা চামড়ার মত শেখরের জীবন থেকে ঝরে যাবে, আর দেখা দেবে কিশলয়ের মত তরুণ সতেজ এক অফিসার—আই, এ, এস্, হওয়াও কিছু আশ্চর্য নয়। পুরাতন পুলিশ-রেকর্ডের কলঙ্ক মুছে দেওয়ার মত ক্ষমতা রুমীর পিতৃকুলের নাকি আছে। বিয়ের পর চামড়াটা যখন আপনা থেকে খসল না, রুমী সেটাকে যতটা মরা মনে

করেছিল যখন দেখা গেল তা নয়, তখন রুমী স্বয়ং শেখরকে সংশোধনে নেমে গেল বিভিন্ন অস্ত্র হাতে নিয়ে। যত সে ব্যর্থ হলো, তত তার জিদ চেপে গেল, শেষ দিকে কীরকম হিস্টিরিয়াগ্রস্ত একটা ভাব ধারণ করেছিল সে। হতাশাগ্রস্ত, ব্যর্থ, অহেতুক জিদবশত অদ্ভুত প্রতিহিংসাপরায়ণ। সে আঘাতের পর আঘাত করে গেল। তার স্বপ্ন নাকি ব্যর্থ হয়েছে। রুমী কি স্বপ্ন দেখতে জানে? হয়ত জানে —তার নিজের মনের মত স্বপ্ন। একের মনের স্বপ্ন অন্যের কাছে মিথ্যা, হাস্যকর। যেমন রুমীর কাছে তার স্বপ্ন।

রুমীর চিন্তাই শেখর আজ বেশী করছে। নাস্তিকেরা নাকি সবচেয়ে বেশি ঈশ্বরচিন্তা করে।

ঐ তো রমেনের বাড়ী দেখা যাচ্ছে। রুমীকে বিদায় দিয়ে রমেনের দরজার কড়াটা নাড়া যাক।

খুলে গেল দরজা।

গোটা পাঁচেক নগ্ন, ধুলিমলিন, শীর্ণ ছেলেমেয়ে দরজাটা খুলে সমস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

'রমেন আছে?'

ধাক্কাধাক্কি করতে আরম্ভ করছে ওরা সামনে এগোবার জন্য। বলল, 'কাকু? আছে।'

'ডেকে দাও।'

'কাকু, কাকু, কাকু।' কয়েকজন ছুটে চলে গেল, কয়েকজন দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

শিশু। টোপনের মত। না, টোপনের মত নয়। পোষাকে নয়, স্বাচ্ছন্দ্যে নয়, স্বাস্থ্যে নয়। রুমীকে ধন্যবাদ। বিলাসিতার ক্ষেত্রে ঝগড়া করেও ধন্যবাদ।

'তোমার নাম কী?' জিজ্ঞেস করল শেখর।

ওরা সংকোচে একটু আড়মোড়া দিল। বলল, 'বিল্টু।'

শেখর তার শীর্ণ পাঁজরের দিকে তাকিয়ে বলল 'বাঃ, বেশ নাম।'

না, টোপনকে সে এখানে দেখতে চায় না। কোন মজুরের ঘরে —ঠিক মজুরের ছেলের মত ? বুকের তলায় উত্তর শোনা যায়—না। যদিও রুমী মনে করে শেখর ছেলেকে মজুর করতে চায়, শেখর জানে তা কত মিথ্যা। টোপনকে সে কী করতে চায় ? নিজেই জানে না সে। গুণ্ডা-বদমাস না হলেই হলো। বস্তুত রুমী-কল্পিত শেখরের মত বড় অফিসার হলেও সে খুব শক্ পাবে না ! অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে বোধহয় কথাটায় ! হয়তো বা নেইও—ছেলের স্বমতে তাকে বাড়তে দেওয়াই তো উচিৎ।

'আরে, শেখর যে !' রমেন এসেছে। 'আয়, আয়।'

'ভেতরে গিয়ে আর কি করব ! এখান থেকেই নেমন্তন্নটা সেরে যাই।'

'নেমন্তন্ন ! বিয়ে করছিস নাকি !'

'সে তো একটা করেই রেখেছি।'

'না, দ্বিতীয়।'

'তুই একটাই করলি না, আমাকে দুটো বিয়ে দিচ্ছিস।'

'ভাগ্যবান তুই।'

'ভাগ্যবানের বৌ মরে, একালের প্রবাদ ?'

'নেমন্তন্নটা কিসের ?'

'পুনর্মিলনের। কান্তি আর সুবর্ণার।'

'অ্যায়, অ্যায়, এখানে কী করছিস্ ?' হঠাৎ ধমক দিল রমেন। ছেলেমেয়েগুলো একটা বৃত্তাকারে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। 'ভাগ্, উদিকে যা।'

প্রায় কুকুর-বেড়ালের মত করে ওদের তাড়িয়ে দিল রমেন। শেখর খানিকটা আহতই হলো। বলল, 'আঃ, ও কী করছিস।'

রমেন বলল, 'আয়, ভেতরে আয়। কান্তি আর সুবর্ণার গল্পটা শুনি।'

টেনেই ভেতরে নিয়ে গেল রমেন। হাত ধরে নিয়ে যাওয়ায়

অবশ্য একটা মস্ত সুবিধে হলো শেখরের। হোঁচট খেতে খেতেও পড়ল না সে। বাড়ীর ভেতরটা ভীষণ অন্ধকার। তায় স্যাঁত-সেঁতে। পুরোনো, একতলা বাড়ী।

একটা ঘরে এনে তুলল রমেন শেখরকে। সে ঘরে দু-একটি বাচ্চা ও একজন মহিলা। মহিলাটি বসে কি যেন সেলাই করছিলেন। শেখররা ঢুকতে ওরা বেরিয়ে গেল। ময়লা কাপড়-পরা মহিলা রমেনের বৌদি—আগে দেখেছে শেখর।

'বৌদি, আমাদের একটু চা পাঠিয়ে দিয়ো তো।' কথাটা ছুঁড়ে দিল রমেন।

'না, আর চা নয়।'

'আরে বোস তুই।'

ভিজে-ভিজে মেজের ওপর তেলচিটে একটা শীতল-পাটিতে ওরা বসল। অন্ধকার-অন্ধকার ঘর। একটা জানলা দিয়ে সামান্য কিছু আলো ঢোকে। অন্য জানলাগুলো পাশের উঁচু-মাথা-ওয়ালা বাড়ির পায়ের তলায় অসহায়। একটা চারমিনার ধরিয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসে রমেন বলল, 'হ্যাঁ, বল।'

'এমন বড় কিছু নয় ব্যাপারটা—'

'বড় নয় মানে? আলবাৎ বড়। বারো বচ্ছর ঘস্‌টে শালা একটা বিয়ে করতে পারলুম না, আর কান্তি এরই মধ্যে, দু-দুটো বিয়ে করে ফেললে।'

'আরে দুটো বিয়ে নয়। মেয়ে একটাই।'

'আরে সে তো আরো বড় ব্যাপার। এক মেয়েকে দুবার বিয়ে করা—এ কি চারটিখানি কথা! রীতিমত প্রতিভা না হলে কেউ পারে না।'

'দুবার বিয়ে করে নি। বিয়ে একটাই।'

'আঃ, বড় ফ্যাচাং করিস তুই। তুই তো প্রফেসর হস নি, হবি ভেবেছিলি, তাইতেই এত নীরস এবং নির্বোধ হলি কি করে!

কার্যত আমার কথাটা ঠিক কি না! বিয়ে ওদের প্র্যাকটিক্যালি ভেঙ্গেই গিয়েছিল—লিগ্যালি ভাঙ্গে নি। উকিলকেই যা গোটাকত টাকা দেয় নি, তাছাড়া ওদের ডিভোর্সের বাকীটা ছিল কি।'

'তা বটে।'

লম্বা করে একটা টান দিল রমেন তার চারমিনারে। আর গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল। এই রকম চলল বার কয়েক। তারপর বলল, 'কি রে, কথা বলছিস না যে!'

'দেখছি।'

'ছাখ। এবং বল্‌। ছুটো ছুই ইন্দ্রিয়ের কাজ। ছুটোয় কোন বিরোধ নেই।'

'কি বলব?

'নেমন্তন্নর কথাটা বল। একদিন গিয়ে খাই-দাই।'

'কেন, নেমন্তন্ন আজকাল একদম পাচ্ছিস না নাকি?'

'পাই রে ছুটো-একটা। সে সব উপহার-বিয়োগে কণ্টকিত। তাছাড়া বন্ধুদের বিয়ের মত হুল্লোড় হয় না। বন্ধু-বান্ধবদের যে কত দিন বিয়ে হয় না!'

'আর হবে না। কারণ সবারই হয়ে গেছে। এক তোর ছাড়া।'

'আঃ, ঐ দাগার কথাটা আবার তোলে। হ্যাঁ, শোন, সবার হয়েছে তো একবার, দ্বিতীয় বার হতে তো বাধা নেই। এই যেমন কান্তি-সুবর্ণার হচ্ছে। তোর সে স্কোপ আরো বেশি।'

'বাজে কথা রাখ। তোর ব্যাপারটা শুনি।'

'আঃ! আগে নেমন্তন্নর খবরটা বল।'

'নেমন্তন্নর আর খবর কী! ওদের পুনর্মিলনের ব্যাপারে বন্ধুরা বলছিল—নতুন করে বৌভাত কর; সেবারে বৌভাতটা একটু অশুভ-ভাবে হয়েছিল বোধ হয়। সুতরাং ওরা ঠিক করেছে, একদিন খাওয়াবে।'

‘তোকে দূত বানাল কেন ?’

‘কান্তির সময়াভাব। সুবর্ণার সংকোচ। অতএব ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।’

‘তা ভাঙ্গা কুলো, খাওয়াবে কেমন ? খুব হুল্লোড় হবে তো ? অ্যায়, চা এসে গেছে। ইদিকে আন।’

একটি অপুষ্ট মেয়ে—বছর পনেরো বয়স—তুকাপ চা নিয়ে ঢুকেছে।

‘রাখ। এখানটায় রাখ। আস্তে রাখ, ভাঙ্গবি যে। আ গেল যা, চোখে দেখতে পাস না ? ফেললি তো চা খানিকটা ? নে শেখর। আরে, তুটো মুড়ি-টুড়ি নেই বাড়িতে ?’

‘আমি মুড়ি খাব না।’ আপত্তি জানাল শেখর।

‘না খাবি—না খাবি। হ্যাঁরে, নিয়ে আয়, তুই আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, যা না।’

মেয়েটা চলে গেল।

‘ওরকম করে কথা বলিস কেন ওদের সঙ্গে ?’

‘তবে কেমন করে বলব ? মধু ঢেলে ? তুধ-মধু না খেলে গলা দিয়ে ওটা ঠিক গড়ায় না। একটু তোয়াজে থাকা দরকার তার জন্য। নইলে—’

‘বুঝেছি, থাম।’ মেয়েটাকে আবার ঢুকতে দেখে বলল শেখর।

মেয়েটি মুড়ি রেখে গেল—তুবাটিতে।

‘নে খা, পেঁয়াজ-মুড়ি তোফা লাগবে।’

‘ভাবছি।’

‘কি ভাবছিস ?’

‘সব। তোর কথাও।’

‘ভাবছিস্ রমেনটা অমানুষ, এই তো! আচ্ছা তুই বুকে হাত দিয়ে সত্যি কথা বল, তুই ঐ বাচ্চাগুলোকে—রুগ্ন, ধুঁকছে, নির্জীব,

খিটখিটে বুড়টে, ঝগড়াটে, ভীষণ রকমের নোংরা—এদের যখন দেখলি তোর গা ঘিন ঘিন করে ওঠে নি? করেছে, মিথ্যে বলে লাভ নেই। অষ্টপ্রহর এদের মধ্যে থাকলে তুই পাগল হয়ে যেতিস। এমন হপ্তা যায় না, ওদের একটা অসুখে না পড়ে। কাঁদে সারা রাত্তির—ঘুমোয় কার বাপের সাধ্যি? ওদের দেখলে রাগ হয়।'

'তুই বিয়ে কর রমেন।'

'কেন, বিয়ে করলে ছেলেপুলে ভালাবাসব? বিয়ে করলেও ছেলেপুলে যাতে না হয় তার চেষ্টা করব। আর যদি হয়, তাতে নিজের ছেলেকে ভালবাসতেও পারি, কিন্তু অন্য ছেলেকে বাসব এমন কোন কথা নেই।'

'যাকগে, তুই বিয়ে করছিস না কেন?'

'এই এদের জন্যে।'

'উত্তেজনাটা কমিয়ে আস্তে আস্তে বল।'

'দাঁড়া তাহলে, চা মুড়ি খেয়ে নি। নে, তুইও খা।'

শেখর চায়ে চুমুক দিল।

রমেন বড় গ্রাস পুরে দিচ্ছিল মুখে।

শেখর জিজ্ঞেস করল, 'তোর বোধহয় খিদে পেয়েছিল।'

'অবশ্যই। তাতে কোন সন্দেহ নেই।' আর এক বৃহৎ গ্রাস।

খাওয়া চুকলে শেখর জিজ্ঞেস করল, 'বিয়ে করছিস না কেন? কত দিন ধরে তুই এনগেজ্‌ড্‌ তার তো হিসেব নেই।'

'দস্তুরমত হিসেব আছে। এগারো বছর সাত মাস।'

'তবে? কি করছিস?'

'বসে আছি কাল গুনে। আমি বিয়ে করলে আমার দাদা বৌদি এবং তাঁদের সন্তানরা না খেয়ে মরে, আর লতিকা বিয়ে করলে ওর বাড়ী অনশন-ব্রতী হয়ে পড়ে। অতএব আরও দু-একটা দিন

যাক, দেখা যাক কি রকম দাঁড়ায়, দেখি আমরা আর্থিক দিক থেকে আরো একটু ভাল করে দাঁড়াতে পারি কি না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।'

'বাধাটা শুধু আর্থিক যদি হয় তবে আর দেরী করা উচিৎ নয়।'

'আর্থিক ছাড়া আর কী বাধা হবে?'

'কত রকম হতে পারে। সূক্ষ্ম—'

'সূক্ষ্ম! সূক্ষ্ম অবধি পৌঁছতেই পারি না। মূল সমস্যাটারই মীমাংসা করতে পারলাম না, তা সূক্ষ্ম। তুই নিশ্চয়ই খুব সাইকলজি পড়িস, তাই না?'

'তা একটু ইণ্টারেস্ট আছে।'

'আমি সাইকলজি পড়ি না।'

'খুব ভাল কথা।'

'লতিকার সঙ্গে যখন প্রথম কথাবার্তা ঠিক হয়, তখন তার কিশোরীর দশা সদ্য শেষ হয়েছে, আর এখন সে প্রায় বৃদ্ধা। এই মোটা কথাটাই চোখের সামনে এমন ভাসে যে সরু কথায় আর যাওয়া হয় না। সূক্ষ্মতাও তো একটা বিলাস হে, চারটি ভাল খেতে পরতে না পেলে কি বিলাস করা যায়!'

'যা হয় হোক, এবার বিয়েটা করে ফেল।'

'উৎসাহ কমে গেছে। এনগেজমেণ্ট জিইয়ে রাখতেই এত শক্তি চলে গেছে যে আজ আর বিয়ের কথা মনেই হয় না। সত্যি শেখর, এই বার বছরের একঘেয়ে কর্তব্যে আর খাটুনিতে আমি এখন ভীষণ ক্লান্ত আর বিরক্ত। এই তুই এলি বলে দুটো হৈ চৈ করে কথা বললাম নইলে আমি ঐ বাচ্চাগুলোকে গাল দেওয়া ছাড়া বিশেষ কথা বলি না। ওদের গাল দিলে বিরক্ত থাকি। গাল না দিয়ে চুপচাপ বসে থাকলে কেমন বিষণ্ণ থাকি। সেটা মনকে বড় দাবিয়ে রাখে, ভেতর থেকে কুরে খেয়ে দুর্বল করে ফেলে। তাই রাগ মারধোর করে একটু গা-ঝাড়া দিই। অবশ্য ওদের ওপর যে খুব প্রসন্ন আমি তা নয়। তবু

আশ্চর্য ছাখ, কীরকম নিখুঁত কর্তব্য করে যাচ্ছি। রোজগার করে সব ঐ অতল গহ্বরে সঁপে দিয়ে আমি ব্যোম ভোলা-নাথ হয়ে বসে থাকি। তোরা খেয়ে নিয়ে বাঁচ তো বাপু। আমার যা হয় হবে। শুধু তোরা দয়া করে বেশি চেল্লাচেল্লি করিস নি। আমার নার্ভ আজকাল বড় অল্পে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। আর একদা-কিশোরী অধুনা-বৃদ্ধা লতিকা, সেও কর্তব্য করছে। এই-ই আমাদের এখন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন আর বিয়ের কথা বিশেষ ভাবিও না। চলছে চলুক। এক আধ সময় তেড়েফুঁড়ে কিছু একটা করতে ইচ্ছে হয়, হাজার হোক মানুষ তো, কিন্তু উদ্যোগ নেওয়ার আগেই আসে কর্তব্য ও দারিদ্রের চোখ-রাঙ্গানি। আমরা অত্যন্ত দুর্বল, অত্যন্ত হীন রে শেখর। এ কর্তব্য করাতেই বা গৌরব কতটুকু—তাও মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে। কিছু না! অনেক বড় কর্তব্য তো করলাম না। শুধু এইটেই বা করছি কেন? এটা সহজে বেশ অভ্যেস-বশে হয়ে যাচ্ছে। নতুন কিছু করতে ভাল লাগে না আর—আর বোধ হয় বিয়ে করতেও নয়। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় মানিকবাবু কুসুমের মুখে বলিয়েছেন, লোহা লালচে গরম ছিল একদিন ছোটবাবু, তখন যা বলতে তাই করতাম, যা করতে চাইতে তাই গড়তে পারতে, আজ লোহাটা বড় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ছোটবাবু। আমারও বোধহয় ঐ দশা। লোহাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শেখর। ঠাণ্ডা লোহাও একটা কাজ দেয়। আমিও একটা কাজ দিয়ে যাচ্ছি—অনড় হয়ে পড়ে থেকে। নড়ে-চড়ে আর কিছু গড়তে পারব না আমি। কেমন যেন মরে গেছি রে শেখর। ঐ যে রাগ-বকাঝকা করি, ওটা শুধু বিরক্তি-ক্লান্তি থেকে নয়, ওটা অনেক সময় ইচ্ছে করেও করি। ঐ সময় একটু মনে হয় যে বেঁচে আছি।'

একটু থামল রমেন। হেসে বলল, 'যাচ্চলে, একটা ছোটখাট বক্তৃতাই দিয়ে ফেললাম যে।'

'অফিস নেই তোর আজ?'

'আছে।'

'যাবি না?'

'গুলি মেরে দোব ভাবছি। সেই ছাত্র অবস্থায় আমরা যখন টুইশনি করতাম, তখন এক আধ দিন আড্ডায় বেশি জমে গেলে টুইশনিতে কিরকম গুলি করে দিতাম মনে আছে?'

'আছে। অফিসে গুলি মেরে দিচ্ছিস কেন?'

'তোর অনারে।'

'না, দরকার নেই। টুইশনিতে গুলি করলে টাকা দেয়। অফিসে গুলি মারলে অন্তত ক্যাজুয়াল লীভ নিহত হবে। তাছাড়া আমায় আরো কয়েক যায়গায় নেমন্তন্ন করতে যেতে হবে।'

'তোর ভেতরে শেখর, বরাবর একটা কাঠখোট্টা লোক রয়ে গেল। নাঃ, তুই একটুও সিভিলাইজ্‌ড্‌ হলি না। যা, গোল্লায় যা, আর আমি অফিসেই যাই এখন—'

॥ চন্দনা ॥

আমি যাচ্ছি। তোমার কাছে। কত জোরে তোমার কাছে যাচ্ছি তুমি জানো না। আমি আরো তাড়াতাড়ি যেতে চাইছি। আমি আমার মনকে রওনা করিয়ে দিয়েছি পৌঁছে দিয়েছি তোমার কাছে। তেমনি ভাবে যদি আমি যেতে পারতুম! তাহলে আমি এখন তোমার ঘরে গিয়ে তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তুমি আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছ। তুমি সাধারণত কম আশ্চর্য হও—অন্তত এখন। কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার সেই বিরল মুহূর্তগুলোতে তোমাকে আশ্চর্য সুন্দর দেখতে লাগে। তোমার চোখে তোমার শৈশবের ছায়া পড়ে, যে-শৈশব আমি দেখিনি। আমি দেখেছি কৈশোরের শেষে, তখনও তোমার চোখে-মুখে শৈশব লুকিয়ে ছিল।

সেই শৈশবকে তোমার কতগুলো বিশেষ মুহূর্তেই মাত্র পাওয়া যায়। যার একটা এই বললাম। আরো আছে। সেই মুহূর্তগুলো আমার মুখস্ত। তুমি নিজেও জানো না তা।

ট্রেনের এই কামরায় একটি মেয়ে যাচ্ছে! ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। বেশ সুন্দর—স্বাস্থ্যবতী ও সজীব। তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলে ঐ বয়সের দিনগুলোকে খুঁজছি। বেশ হাসিখুশী ও দিলখোলা মেয়ে। অনেক গল্প করল। ওর বাবা-মা ছিলেন বার্মায়। যুদ্ধের সময় চলে এসেছেন। তাঁদের কাছে ও বার্মার প্রচুর গল্প শুনেছে। আমাকেও তার কিছু অংশ শোনাল। আমি চুপটি করে সব শুনে তারপর বললাম, 'ছোটবেলায় আমিও বার্মায় ছিলাম।'

'ওমা, তাই নাকি!' কী বিস্ময় আর উল্লাস!

'ওখানেই জন্মেছি। বিদেশের কোলে।'

'দুঃখ আছে তাই?'

'থাকত না, যদি দেশের কোলে ঠাঁই হতো।'

'পাটনা ছেড়ে কোলকাতায় চলে যান না।'

'মেলাতে পারি না।'

'সে কি! বাঙ্গালী হয়ে কোলকাতায় মেলাতে পারেন না?'

সরল মেয়েটা, সহজ। ঠিক ওর বয়সের মত। আমার ঐ বয়স ওর থেকে বেশি-বয়সী ছিল। এক প্রবল আঘাতে আমি হঠাৎ বড় হয়ে গিয়েছিলাম। কুঁড়ির ডগায় জোরে চাপ দিলে ফেটে ফুটে যায় সেটা।

'আপনি বার্মায় ছিলেন তা বলেন নি কেন—আমার বার্মার গল্প বলার সময়?

'শুনছিলাম।'

'আমি না দেখেও বলে দিতে পারি আপনি ছোট বেলায় খুব দুষ্টু ছিলেন।'

হাসলাম। দুজনেই।

'তোমার বাবা-মা তো যুদ্ধের সুরুতে নিরাপদে চলে এসেছিলেন। আমরা এসেছিলাম আরো পরে। তখন যুদ্ধ বার্মার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।'

'এলেন কি করে?'

'হাঁটতে হাঁটতে।'

'সবটা রাস্তা?'

'না, খানিক দূরে আসবার পর গোটাকত ট্রাক পেয়েছিলাম। তারপরে ট্রেন। সারাদিন ধরে আমরা হাঁটতাম—দল বেঁধে। বনের রাস্তা ধরে। রাতে একটা সুবিধেমত জায়গা দেখে ডেরা বাঁধা হতো। রাস্তাতেই আমার একটী ছোট ভাই মারা যায়। বাবা-মার শোক ও উদ্বেগের ভাবটা এখনও মনে পড়ে।'

'বাবা-মা বেঁচে আছেন?' মেয়েটা সরল।

'মা আছেন।'

'বাবা?' আবার প্রশ্ন করল।

'বাবা নেই।'

ওর একাধিকবার প্রশ্নে আমার ভেতরেও উত্তরটা একাধিকবার বাজতে লাগল। নেই, নেই, নেই।

আমার মুখের চেহারাটা বোধহয় পালটে গিয়েছিল। চুপ করে গেল। নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু মনটায় অনেক গুলো ছবির পরপর দ্রুত খেলে যাচ্ছিল, তার একটা ছায়া মুখে পড়া আশ্চর্য নয়। আমি সেই ছবিগুলোর দিকেই তাকিয়েছিলাম।

বাবার ছবি। বাবাকে ঘিরে অন্যান্য ছবি। বার্মার সদা-প্রসন্ন কর্মিষ্ঠ বাবা। বাংলাদেশের পথে পদযাত্রী, উদ্বিগ্ন, সন্তানাদির জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বাংলাদেশের মাটীকে মনে করতেন স্বর্গ—স্বর্গাদপি গরীয়সী। এই মাটীতে পা দিয়ে রূঢ় আঘাত পেলেন—লোকে আমাদের বলত বার্মার আশ্রয়প্রার্থী, রিফ্যুজি। তখন আমাদের ভিক্ষুকের অবস্থা সত্যি, কিন্তু আমরা দেশে ফিরে এসেছি তো, আমরা তো বাইরের লোক আশ্রয়ের জন্যে আসিনি। কে শোনে সে কথা। আমরা রেফ্যুজি। বাবা বিক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, বেদনার্ত।

তবে রেফ্যুজি পরিচয়টা আমাদের নামের সঙ্গে খুব বেশি দিন টেঁকে নি। বাবারও মেজাজটা ক্রমে ভাল হচ্ছিল। আর্থিক দূরবস্থা চলছিল খুবই, সে-আঁচ যত যত্নেই আড়াল করা হোক না, একটু-আধটু আমরা টের পেতাম। তবু বাবা যে দেশে ফিরে এসেছেন এই আনন্দেই খুশী ছিলেন।

ক্রমে বাবা একটু স্থিতি পেলেন ঢাকায়—তাঁর মাতৃভূমিতে, তাঁর পিতৃপিতামহের দেশে। ঢাকা সহরে একটা চাকরি নিয়ে তিনি সংসার পাতলেন। তখন দাদাকে কোলকাতায় পাঠানো হয়েছিল পড়তে।

তারপর দেশ স্বাধীন হলো এবং দেশবিভাগ হলো। রাজ-নৈতিক নেতারা উভয় বঙ্গে রাজত্ব করতে লাগলেন। একটা অস্থির অবস্থা চলছিল। রাজনৈতিক জগতে খেয়োখেয়ি। সাম্প্রদায়িক খুনোখুনি। দলে দলে লোকের দেশত্যাগ। চারিদিকে একটা থম-থম করা আশংকা, আর ভয়ংকর রকমের অনিশ্চয়তা।

এই রকম সময়ে এল সেই কালো রাত্রি। কালনাগিনীর মত। আমাদের বাড়ী আক্রান্ত হলো।

সেই ঘর শেখর, যে ঘরে এসে তুমি বসেছিলে, যে ঘরে কতদিন খেলেছি বসেছি ঘুরেছি, সেই ঘরেই এসে উপস্থিত হলো আক্রমণের জেহাদী সৈনিকেরা। বাবা বৃদ্ধ অবস্থায়ও রুখে দাঁড়ালেন। একটা মাঝারি গোছের ছোরা ঝলসে উঠে বাবার দেহের মধ্যে মুহূর্তের জন্য লুপ্ত হয়ে গেল। মুহূর্ত পরে যখন ছোরাটা বেরিয়ে এলো তখন তার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে গেছে। রংটা ভোঁতা, লালচে। লাল লাল বিন্দু ঝরছে। বাবা 'ওঃ' বলেই মেঝেতে পড়ে পেটের উপরটা চেপে ছট ফট করছেন। মেঝেটা লাল হয়ে গেছে।

ততক্ষণে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দাদা। পেছন থেকে একটা লোহার রড সজোরে তার মাথায় পড়ল। আর ঐ ছোরাটাও হয়তো তাকে স্পর্শ করেছিল—কিন্তু সে আর দেখতে পাই নি, আমাদের ওপর আক্রমণ সুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে।

তবে ওরা টাকাকড়ি ও জিনিষপত্রের ওপরে লক্ষ্যটা দিল। সেইগুলোকে নিয়ে ওরা চলে গেল। শাসিয়ে গেল যে আবার আসবে যদি না আমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাই। বামাল সরাবার তাড়া ছিল ওদের।

আমরা মেয়েরাও লাঞ্ছিত হয়েছিলাম। চূড়ান্ত আকারে নয়। খণ্ড বিচ্ছিন্ন আকারে। লালসার লোলুপ থাবা আমাদের গায়ে তার স্বাক্ষর রেখে গেল। জ্বলতে লাগলাম আমরা। সারা দেহে মনে আমরা জ্বললাম শেখর, কিন্তু ঠেকাতে পারলাম না। 'ঢাকার মেয়ে'

বলে আমাদের একটা গৌরব আছে। গর্ব করে থাকি আমরা ও কথাটা বলে। সে গর্ব ধুলোয় গুঁড়িয়ে গেল। কেন মারতে পারলাম না? কেন মরতেও পারলাম না—দাদার মত, বাবার মত।

মুহূর্তের মধ্যে ঝড়ের মত ঘটনাটা ঘটে গেল। কেন বেঁচে রইলাম? বেঁচে থাকবার কী দরকার, এ প্রাণের এর পরেও কী মূল্য? মানুষ যে মূল্যহীন, তার মর্যাদা বা অধিকারের কোন দাম নেই, সে কুকুর বা শেয়াল বা হয়তো একটা মাটির ঢেলা। সেই রকম মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার লোভ ও কাপুরুষতা নিশ্চয়ই আমারও মধ্যে আছে, এ কথা ভেবে নিজেকে ঘৃণা করলাম।

যথাকালে, অর্থাৎ ঘটনা ঘটে যাবার পরে পুলিশ এল, জানতে চাইল আমরা এখানে থাকতে চাই কি না। ভাবে লক্ষণে বলল যে এখানে থাকাটা তেমন নিরাপদ নয়। পরের কথা পরে, এখন রাত্তিরটা আমার কোথায় থাকব—তাও জিজ্ঞেস করল।

মা ওখানে থাকতে রাজী হলেন না। আমাদের একটা স্কুলে—আরো অনেকের সঙ্গে রাখা হলো রাত্তিরটা। মা বললেন, 'এই রাত্তিরই আমার এখানে শেষ।'

শেষ কপর্দক খুইয়ে এরোপ্লেনে আমরা কোলকাতায় পৌঁছলাম। আর একবার আমরা ভিখিরি হলাম। সেবার তবু বাবা ছিলেন আমাদের মাথার ওপর। এবার মা আর আমি, আর কতগুলো ছোট ভাইবোন।

মা শোকে লাঞ্ছনায় কয়েক দিনের মধ্যে বৃদ্ধ হয়ে গেলেন, আর অত্যন্ত গম্ভীর। থমথমে একটা মুখ নিয়ে মা যেন সব সময় কি ভাবতেন।

সব দায়িত্ব এসে পড়ল আমার ওপর। আমারও শোকের অশ্রু ছিল, লাঞ্ছনার দাহ ছিল, কিন্তু সেদিকে তাকাবার সময় পেলাম না। কলেজের ছাত্রী আমি তখন এই মেয়েটির মত, যে

এখন জানলায় হাতের ওপর চিবুক রেখে দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে আছে। ঈর্ষা করছি না ওকে। শুধু ওকে দেখে আমার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে।

দিদির আগেই বিয়ে হয়েছিল—কোলকাতায়। জামাইবাবু এবং ওঁদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের একটু খটাখটি ছিল—দিদির বিয়ের সময় থেকেই। মা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কয়েকদিনের জন্যে ওখানে উঠতে বাধ্য হলেন।

মা কথা বলা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলেন। এসে মুখ খুলে বললেন, 'চাকরির চেষ্টা কর।'

চেষ্টা চলছিলই। আরো জোরদার করা হলো। জানাশুনো এখানে এত কম যে কোথায় চেষ্টা করি। যাই হোক একটা টেম্পোরারী স্কুল-মাস্টারী পেলাম—নিচের শ্রেণীর জন্য। আমার বিদ্যেও নিচু দরের। মা বললেন, 'এখান থেকে অন্য কোথাও যাব।'

আমি বললাম, 'এই টাকায় চলবে কি করে।'

'চালাতে হবে।'

যাওয়ার দিন জামাইবাবুরা কেউ অসুখী হলো না। দিদি, শুধু আড়ালে আমার হাত ধরে কাঁদল। বলল, 'আমি যদি ছেলে হতাম, তাহলে—।'

আমার চোখেও একটু জল এল। বাবার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আমার। একটা বেদনাময় গৌরবে আমার বুক ভরে উঠল। বাবার কাজ আমি করছিঃ বাবা, আমি যখন আছি, তখন আমার ভাইবোনেরা—তোমার ছেলেমেয়েরা না খেয়ে মরবে না, তুমি ভেবো না। দাদা ও দিদি—ওদের কাজও আমি একাই করছিঃ দাদা, কোথায় তুই এখন, দুঃখ পাস না যেন আমাদের কথা ভেবে, আমরা ভাল আছি, নতুন করে আবার আমরা সুরু করছি।

এসে উঠলাম এক রেফ্যুজি কলোনীতে। খাঁটি কলোনী,

সমাজ-বিচ্ছিন্ন, ক্ষুধার্ত, নোংরা। ক্ষুদ্রতা আর নানা দুর্নীতি সেই সুযোগে এসে বাসা বেঁধেছে। ওরা আমরাই। দুদিনে এক হয়ে গেলাম। লোকে আমাদের রেফ্যুজি বলত—এই বাংলাদেশেই। বাবা, তুমি বেঁচে গেছ, নইলে তুমি আবার রেগে উঠতে—সেই তোমার সরল ক্রোধ!

আমি দুটো একটা স্বল্প অর্থের টুইশনিও সুরু করলাম। দু'মুঠো অন্ন জুটত—বহু ক্লেশে। কিন্তু সেই ক্লেশের গৌরব আমার শোক ও দাহের পুরোনো ঘায়ে কিঞ্চিৎ প্রলেপের কাজ করেছিল।

বিপুল সংগ্রাম ছিল অন্য একটি ক্ষেত্রে। প্রতি মুহূর্তের দুর্দশা ও সমাজ-বিচ্ছিন্নতা এই কলোনীতে মানুষের মহত্বকে নষ্ট করে, তাকে টেনে নিচে নামায়, ধীরে ধীরে সেটাই স্বাভাবিক বলে বোধ করায়। সেই অস্বাভাবিক 'স্বাভাবিকতা'র বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করেছি—ছোট ভাইবোনেদের রক্ষা করবার জন্য! সে এক দুঃসহ সংগ্রাম। এবং হয়তো পুরোটা জিতি নি। জেতা সম্ভব নয়। ওরা আমরাই।

টেম্পোরারী চাকরীটা এমন সময় চলে গেল। মা এসে থেকেই নানা সূত্রে তোমার খোঁজ করছিল, শেখরদা। হঠাৎ দিদি এই রকম সময় কোন্ এক সূত্রে—বোধ হয় জামাইবাবুর পরিচিত মহলের মাধ্যমে—তোমার সন্ধান দিল।

গেলাম একদিন তোমার কাছে। ঢাকার সেই দিনের পর এই প্রথম। তুমি একা তোমার ঘরে বসে ছিলে। তোমার মুখ থমথম করছিল। কী এক দুশ্চিন্তা এবং অস্থিরতা তোমাকে ভেতর থেকে পীড়ন করছিল। তোমার ভ্রূ মাঝে মাঝে কুঁচকে কিছু একটা ভেবে নিচ্ছিল। আঙুলগুলো এক এক সময় অস্থিরভাবে নড়ছিল। তুমি তখন অন্যজগতে ছিলে। ঢুকেই বুঝলাম, আমি বাইরের লোক, খুব বাইরের লোক। তুমি অনেক দূরের জগতে আছ। স্পষ্ট বুঝলাম, তুমি আমায় দেখে চিনতে পারলে না। পরিচয়

দিলাম। চিনলে। শেষদিকে দাদার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ছিল না। তুমি তোমার রাজনীতি নিয়ে প্রমত্ত ছিলে। তাই এদিকের খবর কিছু জানতে না।

বললাম খবর। দ্রুত। সংক্ষিপ্তভাবে। জজের সামনে কাঠ-গড়ায় ভীত সন্ত্রস্ত আসামীর সাক্ষ্যের মত। তোমার মনের প্রতিক্রিয়া কিরকম হলো তা বুঝতে পারলাম না। অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা তোমার দেহের গ্রন্থিতে দানা বেঁধেছিল! তাদের সরিয়ে আমার কথাগুলো কতটা স্থান করতে পারল সন্দেহ ছিল।

শেষে বললাম, 'চাকরী খুঁজছি একটা।'

কী যেন ভাবলে! বোঝা গেল কিছু উপায় করে উঠতে পারছ না আমার জন্যে।

তাড়াতাড়ি বললাম, 'বলে রাখলাম। খবর পেলে—'

'খবর পেলে! না, আজকেই কিছু করতে না পারলে অসুবিধে।'

আমরা অসুবিধে তো বটেই। তুমি একটা কাগজের পাতা মোচড়াতে মোচড়াতে জিজ্ঞেস করলেম, 'কী ধরনের কাজ করতে চাও তুমি?

'যে কোন কাজ?'

'নার্সিং?'

পেশাটা সম্পর্কে ভাবা ছিল না, শোনা ছিল নানা কিছু। খারাপই বেশি। একটু ইতস্ততঃ করলাম।

'জানি—এ পেশাটায় অনেক অসুবিধে আছে। তাছাড়া বাড়িতে তোমার মা-রও মত হবে কি না জানি না, অন্য চাকরী পেলে না হয় করো না। আপাতত আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে। বাড়িতে মা-র মত হলে চিঠি নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে। মা-র মত না থাকলে এই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলো—সঙ্গে রেখো না।'

আমি চিঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'যা করি আপনাকে জানাব।'

'আপনি' বললাম ? আমার মনে আমি তোমাকে 'তুমি' বলতাম, কিন্তু তখন উচ্চারণ করতে পারলাম না।

তুমি বললে, 'না। এখন মাস কয়েক আমার সঙ্গে দেখা করো না।'

আহত হয়ে বেরিয়ে এলাম, প্রায় কান্না পাচ্ছিল। ভয়ংকর কঠিন মনে হচ্ছিল তোমাকে, আর অত্যন্ত উদাসীন, দূর। রাগও হচ্ছিল : কেন গেলাম। ভাবলাম, যাব না ঐ ডাক্তার-বন্ধুর কাছে।

কিন্তু গেলাম। নার্সিং-এ 'ট্রেনী' হিসেবে ঢুকেও পড়লাম এক হাসপাতালে। কয়েক মাস পরে দেখাও করতে গেলাম একদিন তোমার সঙ্গে—লজ্জার মাথা খেয়ে অথবা কৃতজ্ঞতাবশত, অথবা আর কোন টানে কে জানে।

গিয়ে শুনলাম, তুমি জেলে। কারণ—রাজনৈতিক। কিছুটা বুঝলাম। সবটা নয়। তোমার ওপর থেকে রাগ চলে গেল।

আর আট ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করে যখন নার্সেস কোয়া-র্টারে এসে গরম জলে পা ডুবিয়ে কালকের জন্যে পা ত্বটোকে তৈরী করতাম, কিংবা সিঙ্গল-সীটেড্ ঘরে যখননিজের কাছে নিজেকে মেলে ধরতাম, অথবা সপ্তাহান্তে মা-ভাই-বোনেদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যখন বাসের একটা প্রান্তীয় সীটে বসে চলমান রাস্তার দিকে চোখ ছেড়ে দিতাম, তখন তোমার ঘরটার কথা মনে পড়ত—যে-ঘরে আমি মাত্র একদিনই গিয়েছি, আর হয়তো কোনদিনই যাব না। ঘরটা হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। খালি মনে হত ঘরটা ভাল করে দেখা হয় নি। ঘরের মালিকের কঠোর অস্তিত্ব ঘরকে ছাপিয়ে এমন ভাবে জেগে ছিল যে অন্য কোন দিকে কিছু দেখা অসম্ভব ছিল।

সামান্য মনে আছে। ছোট একটা বিছানা জড়ো করা এক প্রান্তে। মেজের ওপরে কতগুলো বই ও কাগজ—টেবিল আলমারি উপচে ওখানে জড় হয়েছে। চেয়ারে বসেছিলে তুমি। একটা পা সামনের দিকে টান করে দিয়ে। মাঝে মাঝে সে পা-টা কাঁপাচ্ছিলে—অস্বস্তিতে অথবা চিন্তায়। আর তোমার পা-র সোজা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল সেই লাইট স্ট্যাণ্ড-টা। দীর্ঘ তন্বী চিক্কণ একটা স্ট্যাণ্ড। মস্ত লম্বা। ছোট একটা গাছের মসৃণ কাণ্ডের মত। তার মাথায় একটা আলো। আলোকে ঘিরে বড় একটা সুন্দর কাজ করা আলো-ঢাকনি—ছোট-খাটো একটা ছাতার মত। হালকা একটা আলোর আস্তরণ ছড়িয়ে ছিল এই আলোর গাছটার চার-ধারে। সেই বৃত্তের পরিধির মধ্যে পড়েছিল তোমার অনেকখানি দেহ। আর আমি দাঁড়িয়েছিলাম তোমার পাশে, একটু পেছনে, বৃত্তের বাইরে। সেই আলোর গণ্ডীটা গাছটিকে ঘিরে রেখেছিল।

আমাদের ঢাকার বাড়ির পাশে লম্বা একটা শিউলি গাছ ছিল! শরতে—হ্যাঁ এমনি সময়ে, ভাদ্রের শেষ আর আশ্বিনের শুরু—ফুলের উৎসব লেগে যেত। ফুটত, ঝরত, সাদা। গন্ধ—ঐ ওপর নিচের সাদা বৃত্তকে পেরিয়ে নানা দিকে ছুটে চলে যেত গণ্ডীর বাঁধন পেরোবার উল্লাসে। সেই গাছটা জ্যোৎস্না রাতে আলোর গাছ হয়ে যেত।

সে আলোর গাছ ঐ কালো রাত্তিরের পরে আর আমি ভাল করে ভাবতে পারতাম না। ভাবলেই সাদার গায়ে লাল-লাল কালো-কালো দাগ ধরে যেত। সেই গাছ আমার শৈশব-কৈশোরের সঙ্গে এক হয়ে ছিল। যৌবনে সে দূরে চলে গেল। তাকে আর ধরতে পারতাম না। তোমার ঘরটা আমার মনে কি এক বাতাস বয়ে আনে। সেই গন্ধ আর শৈশব, শিউলি আর জ্যোৎস্না, ফুল আর আমি, গাছ আর আলো, হালকা সাদার গণ্ডী আর আমার নিরুদ্ধ যৌবন, তোমার অস্থিরতা ঢাকা মুখ আর আমাদের বাড়ির

সেই ঘর, তোমার বইপত্তরের স্তূপ আর আমাদের বাড়িতে তোমার প্রথম-আসা সন্ধ্যা—সব এক হয়ে মিশে যায়। এলোমেলো। চেতনার আর এক প্রত্যন্ত-তল। শিউলির গন্ধটা যেখানে ভোমরার প্রাণের মত সঞ্চিত।

। শেখর ।

রমেনের কথাগুলোকে শেখর উলটে-পালটে নেড়ে চেড়ে দেখছিল। বারোটা বছর। শুকিয়ে যাচ্ছে রমেন, লতিকা। ওদের মন। অর্থসংকট। সেই পুরাতন অথচ চিরনূতন কথা। চটকল-মজুরের অন্ন নয় শুধু, মধ্যবিত্তের যৌবনকেও হরণ করছে নিপুণ হাতে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল শেখর। কোলকাতার রাস্তা। কঠিন, নিরেট। দুপাশে আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদের পাঁচিলের মধ্যে এক একটি গভীর খাদ।

আর্থিক সমস্যা কি রুমীর এত বেশী যে তাকে দেশত্যাগী হতে হবে? ও তো বলল যে এটা নিছক ইণ্টারভ্যু মাত্র। তবে কেন ভয় পাচ্ছে শেখর? প্রবল আর্থিক সংকটকে একদিন পেরিয়েছে চন্দনা। একার ওপর একটি পরিবারের সমস্ত দায় বহন করেছে। শৈশব-কৈশোরে শেখরও খুব বড় সংকট পেরিয়েছে।

'আরে শেখরভাই যে!' চটকলের ছাঁটাই মজুর এবং ইউ-নিয়নের দায়িত্বশীল কর্মী রমজান আলী। শক্তসমর্থ স্বাস্থ্য। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। সামান্য অক্ষরজ্ঞান ছিল আগে। এখন বেশ পড়তে লিখতে পারে। খুব কর্মতৎপর। মজুরেরা মানে খুব। নেতৃস্থানীয় কর্মী সে একজন।

'আরে রমজান যে। এদিকে?'

'এসেছিলুম শ্বশুর বাড়ি। তবে সুখে নয়, দুঃখে।'

'কী দুঃখ?'—জিজ্ঞেস করল শেখর।

'দুই বিবি জানো তো?' হাসল রমজান আলী। 'যা নিয়ে তোমার সঙ্গে মতের ফারাক! মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ। খুব মনে আছে।'

ভারত সরকার যখন 'এক বিবাহ' আইন প্রবর্তন করেন, তখন শেখর বলত, এক-বিবাহ আইন শুধু হিন্দুর নয়, মুসলমানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত ছিল। ভারত সরকারের যুক্তি ছিলঃ বিবাহ ধর্মীয় ব্যাপার। রাষ্ট্র ধর্মে হাত দিতে পারে না। শেখরের মত ছিলঃ বিবাহ সামাজিক ব্যাপার। ভারত সরকার অবশ্য শেখরের কথায় কর্ণপাত করে নি। তখন এই সব নিয়ে আলোচনা হত। হিন্দু সমাজে 'এক-বিবাহ'-র চিন্তা উনবিংশ শতকের গোড়ায় দেখা দিয়েছিল, মুসলিম সমাজে এখনও বিশেষ আসে নি, এবং অন্য সমাজের লোকেরাও এ সম্পর্কে কথা বলে না, কারণ ওটা বিশেষ ধর্মের 'ঘরোয়া' ব্যাপার। ব্যাপারটা যে সামাজিক, এই সত্য কথাটা বলতেও দ্বিধাগ্রস্ত। এটাও এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, কারণ সম্প্রদায়-সংস্কারের কাছে সত্য ধিকৃত হচ্ছে। শেখর দেখেছে, মুসলিম সমাজে—এমন কি শিক্ষিতদের মধ্যেও বহু বিবাহের বেশ সমর্থন আছে। যথেষ্ট শিক্ষিত মুসলিম নেতাকে সে জানে যাঁরা 'বহু-বিবাহিত'। তরুণদের মধ্যে হয়তো এটা কমছে, তার কারণ কিছুটা অর্থনৈতিক, কিছুটা অবশ্য অগ্রসর-চিন্তা। রমজান আলীর সঙ্গেও তখন এই নিয়ে কথা হয়েছিল। আসলে শেখর বুঝতে চেষ্টা করত ব্যাপারটা। রমজান এই সব প্রশ্নে কেমন যেন একটু বিব্রত বোধ করত, লক্ষ্য করেছে শেখর। বলত, 'মেয়েদের আপত্তি না থাকলে তুমি কেন আপত্তি করবে, শেখর ভাই।' এ কথাটার পালটা শেখরের অনেক যুক্তি ছিল। রমজান ঠিক এঁটে উঠতে পারত না, শেষটায় হেসে বলত, 'শেখরভাই, তুমি দু-তিনটে বিয়ে করতে পারছ না বলে হিংসেয় এত কথা বলছ।'

আজ রমজান বলল, 'তোমার কথাই ঠিক। বিয়ে একটা করাই ভাল, বা একেবারে না করা। বড় বিবিকে তো আগেই তার বাপের বাড়ি পাঠিয়েছি। আজ ছোট বিবিকে তার বাপের বাড়ি রেখে এলাম।'

মুহূর্তে আগের সব তত্ত্বগত চিন্তা বিলীন হয়ে গেল। রমজানের সংকট এখন খুব বড়। পাটকলের মালিকরা কাঁচা পাটের স্বল্পতার অজুহাত তুলে লোক ছাঁটাই করেছে। রমজান ইউনিয়নের কর্মী বলে তার ওপর বাড়তি রাগ ছিল। রমজান ছাঁটাই হয়ে গেছে অনেক দিন। পাটের স্বল্পতার কথা সরকারও স্বীকার করে না, কিন্তু তাঁত চালু রাখতে তারা অপারগ। রমজানের ব্যাপারটা কিছুটা স্বতন্ত্র বলে এটা লেবার ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সে মামলা ফয়সলা হতে বিবি দুজন কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে অনশনেই মরে যাবে। তাই এই আপৎকালীন ব্যবস্থা। পিত্রালয়-প্রেরণ। রমজানকে বেশ বিমর্ষই দেখাচ্ছে। তাকে বলবার মত কথা এই মুহূর্তে শেখর কিছু খুঁজে পেল না। তার যে-জীবনটার সঙ্গে নিজের ভাল করে জোড়া লাগে নি, সেই জীবনের একটা অংশ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বলে। এতক্ষণ সে অন্য চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ছিল। এখন এ আর এক জগৎ। তারই সে জগৎ, অথচ তার নয়ও। একে ধরবার জন্য তত্ত্বগতভাবে যতটা প্রস্তুত, কার্যত ততটা নয়। তার এ আত্ম-বিরোধের কথা সে অনেকদিন থেকে জানে। এই মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে কোন কথাটা আসা উচিৎ জিভের ডগায়, বা অন্তত কোন কথাটা ভদ্রতা করে বলা উচিৎ, তা সে খুঁজে পেল না। এমনিতেই আনুষ্ঠানিক ভদ্রতা তার কম আসে, এদের সঙ্গে ব্যবহারে একেবারেই আসে না। আনতেও চায় না সে সেটা। মনে হয়, সেটা এক রকমের অন্যায়। তাছাড়া মুহূর্তটাও 'ডেলিকেট'। যদি এ সংকট তার নিজেরও হতো, তবে মুখে কিছু বলতে হতো না, সমব্যথী ভাবটাই হয়ে যেত সেতু, নীরব ভাষা। এখানে তা নয়। শুধু রমজানকে সে একবার রমেনের পাশে রাখল। মিল আছে বোধহয় বহু অমিল সত্ত্বেও। শেখরের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে। কিন্তু আপাতত সে তার বই ও নানা খুচরো লেখার দাক্ষিণ্যে মোটামুটি স্বচ্ছল। সে তার দারিদ্রের অভিজ্ঞতা

থেকে দেখেছে যে ওটায় ঠিক কোন সান্ত্বনার প্রলেপ দেবার নয়। হয় মেনে নাও, নয় তো হটাবার চেষ্টা করো। মাঝামাঝি পথ নেই। প্রতিদিনের দারিদ্রের জ্বালা কোন প্রলেপে উপশম হয় না। ভাগ্যিস রুমী দরিদ্র নয়। টোপনকে অনশনের জ্বালা সইতে হয় নি। রমজানের ছেলেমেয়েরাও এখন দিন কাটাবে তাদের বাবাকে ছেড়ে, আর হয়তো অনশনের মুখে দাঁড়িয়ে। না, রমেন হয়তো ঠিকই করেছে। ব্যাপক ছাঁটাই হয়েছে এবার ও চটকলে। ইউনিয়ন লড়ছে, কিন্তু এখনও সাফল্য সামান্য। মজুররা অনেকে কিছুদিন অপেক্ষা করে পেটের দায়ে ছড়িয়ে গেছে। কেউ অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করছে। দুচারজন পেয়েছে। কেউ কেউ দেশে চলে যাচ্ছে।

শেখর বলল, 'রামধনিয়া দেশে চলে গেল কাল।'

'হ্যাঁ। আমার তো দেশ-গাঁ কিছু নেই। বর্ধমানে আমাদের দেশ। সে যে কবে লোপাট হয়ে গেছে। বাপজান ছিল রাজমিস্তিরী। এই কোলকাতার অনেক বাড়িতে তার হাতের ছাপ আছে। ওস্তাদ মিস্তিরি ছিল। ছোটবেলায় আমরা বাপজানের সঙ্গে যোগাল খেটেছি। আমি আর আমার বড় ভাই। ঐ চৌরঙ্গীতে মেট্রোর সামনে মিস্তিরিদের যে বাজার বসে ওখানে আমরাও যেতাম। তারপর একদিন বড় ভাই পড়ে গেল—ভারার উপর থেকে। বড় ভাই আমার বড় ছটফটে ছিল। বাপ তাকে 'হারামজাদ' ছাড়া কথা বলত না! কিন্তু ওকে গোর দেওয়ার সময় বাপজান হাউহাউ করে কেঁদেছিল। দুই গোবরায় গেছলাম আমরা বড় ভাইকে মাটি দিতে। ধর্মতলায় একটা বাড়ির তিনতলা নাগাদ উঁচু থেকে ও পড়ে গিয়েছিল। ঘাড়মোড় গুঁজড়ে একেবারে ডেলা পাকিয়ে গেছল। রক্তে লাল হয়ে গেছল ডেলাটা! বাপজান আমায় বলেছিল—এই আমিই শেষ, আর রাজের কাজ করিস নি। বাপজান অবিশ্যি আরো কিছু দিন করেছিল। পেটের দায়ে। অন্য কি কাজ আর করবে তখন। আমি অন্য কাজে-কামে লেগে গেলাম। ভাবছি আবার রাজের

কাজে লাগলে কেমন হয়। বাপজান রোদে-জলে খুব উঁচুতে চড়ে কাজ করত। আমিও করব। মন্দ কি! কি বল শেখরভাই? কাজ তো কাজ। কোন কাজে বিপদ নেই বল। সব কাজেই আছে। তবে? রাজের কাজ একটু জানি তো। তাছাড়া ও কাজে লোকজন আছে জানাশোনা। ভাবছি। দেখি না হয় আর কয়েকটা দিন। তোমাদের সঙ্গে ছাড়ান পড়ে যাবে—তাই ভাবছি। কিন্তু বিবিদের তো আর চিরটাকাল বাপের বাড়ি রেখে দিতে পারি না। রাজের কাজেই হয়তো টিঁকে যাব শেষ অবধি। আমার ছেলেরাও আর দু-এক বছর পরে যোগাল দিতে পারবে। কোলকাতা শহরের ডগায় চড়ে বাপজান আর বড় ভাইকে মনে পড়বে এক-আধ সময়। আশমানটার দিকে তাকাব একবার। সত্যি, মানুষ মরলে কি হয় শেখরভাই? তুমি তো অনেক পড়েছ, অনেক উঁচুতে চড়ে কোলকাতা শহরটা কোন দিন দেখেছ? সে বেশ মজাদার দেখতে হয় কিন্তু সব ছোট হয়ে যায়।'

ছেলে যোগাল দেবে! টোপন! টোপন শেখরের কাজে করে যোগাল দেবে? শেখরের কি কাজ! শেখরের নির্দিষ্ট কোন কাজ নেই। বাপজান আর বড়ভাই। চন্দনার সঙ্গে মিল আছে—বাবা আর দাদা তার। মৃত্যুর কারণ দুটো আলাদা। কি জানি, হয়তো কিছু মিল আছেও অন্তরালে। চন্দনা থাকলে বলত, 'বই পড়ে পড়ে ঐ বিদ্যেটা শিখেছ খুব। কূট যুক্তি।' হয়তো যুক্তিটা কূট। কিন্তু সত্যি কিনা তাই বিচার্য। রমজান চলে গেলে ইউনিয়নের বেশ ক্ষতি হবে, দুমাস বাদে ইউনিয়ন অফিসে আর কোন দিন রমজানকে দেখা যাবে না এ কথা ভাবা যায় না। ক্ষতি কিছুটা যেন শেখরের ব্যক্তিগত। তবু সময় বসে থাকবে না। ও চলে গেলে টাল খাবে, তবু চলবে! ননী চাটুজ্যে যখন চলে গেল, তখন ইউনিয়নের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির আঘাতে সাধারণ কর্মীরা তখন হতাশ, নিষ্ক্রিয়, হৃতোদ্যম। ননী চাটুজ্যেরও

লেগেছিল সেই ধাক্কা। ননী চলে গেল, বলে গেল, 'একটু ভেবে নিতে হবে, নইলে কিছু করতে পারছি না।' শেখর নিজেও চোট কম জোরে খায় নি। যাই-যাই করেও অভ্যাস বশে ধরে আছে। কিন্তু প্রথম যৌবনের উৎসাহ নেই। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আছে বহু সংশয়। আগের প্রেরণা এখন স্তিমিত, অবসিত। রাজনীতির কথা ভেবে ততটা নয়, যতটা এখানকার মানুষগুলোর জন্যে সে এখানে রয়ে গেল। অথচ রাজনীতির ভিত্তির ওপরে কর্মপ্রয়াস না দাঁড়ালে নিছক শুভ-ইচ্ছা তাকে কতদিন টিঁকিয়ে রাখবে? এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সে দাঁড়াবেই বা কোথায়! কৈশোর থেকে জীবনের অবলম্বন বলে যাকে ধরেছিল, তাকে ছাড়া মুস্কিল।

'শেখরভাই, ওখানে ঐ ইউনিয়নের অফিসে তোমাকে বেশ চিনতে পারি। এখানে এই কোলকাতার ভেতরে তোমাকে অন্য রকম লাগে।'

'তাই নাকি।' আশ্চর্য হলো শেখর, জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম লাগে?'

'অন্য রকম, একটু আলাদা, কথা বললে বা হাসলে তবু অনেকটা এক। চুপ করে থাকলে একদম আলাদা, মনে হয় তুমি যেন খুব ভাবছ, আর খুব পণ্ডিত। কোন ইস্কুলের মাস্টার—না কোন কলেজের প্রফেসার মনে হয়।'

'সে কি! আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এই ভাবছিলে নাকি কি সর্বনাশ!'

'না। গোড়ায় একটু ইয়ে হয়েছিল। তারপর—'

সে আলাদা। রমজান ঠিকই বলেছে। শেখর জানে। সে চেষ্টা করেও এক হতে পারে নি। সে ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে হাঁটু অবধি কাপড় তুলে বসে। বিড়ি খায়, এমনিতে যদিও তার ধূমপানের নেশা নেই। বেশ উচ্চ কণ্ঠে স্বাভাবিক ভাষায় সবার সঙ্গে কথা বলে। এ সম্পর্কে সে সচেতন থাকে। আর এইখানে, এই পাটের-ফেঁসো

ওড়া আকাশ থেকে দূরে, সভ্য নগরে কালো কঠিন পথে মার্জিত পদ-ক্ষেপে যখন সে পথ চলে, তখন সচেতনতার চিহ্নমাত্র মনেতে থাকে না। ফলে সে পালটে যায়, বা স্বরূপে ফিরে আসে। রমজান যেমন বলল। দুই সত্তা তার। সে কিন্তু এক চেয়েছিল। দুই দিকে দুই মুখ এক দেহে—এ বিড়ম্বনা সে চায় নি। প্রথম যৌবনের দিন-গুলোয় শেখর বোধহয় অনেকটা এক হয়েছিল। তবে সে শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসে, জীবনের গভীরে হয়তো নয়। তবু তা কাজ দেয়। আরো দিত। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনীতির বৃহত্তর আঘাত তার আস্থা আবেগ ও প্রেরণাকে খণ্ডিত করে দিয়েছে। প্রথম দিকে এ সব টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল। আর সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে সে অস্থির ভাবে কাল কাটিয়েছে—একটু জোড়াতাড়া দিয়ে কিছু একটা দাঁড় করাতে চেয়েছে। পারেনি। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতেই চলেছে। দুটো একটা মানুষ দেখে একটু ভরসা হয়, কিন্তু সে সামান্য এবং সাময়িক। সে ভাঙ্গছে। সে জানে। সে ভাঙ্গনকে রোধ করবার জন্য এখনও সে আঁকড়ে ধরে আছে ইউনিয়নের এই মাটি। এখানে রাজনীতির বৃহৎ ব্যাপার বাদ দিয়েও কিছু সাধারণ ভাল মানুষ আছে। তাদের সংস্পর্শকে সে পান করে। তাদের বুঝতে চেষ্টা করে, অনুভবে, বুদ্ধিতে।

সম্প্রতি-খ্যাত এক ইংরেজ নাট্যকারের একটি নাটকে শেখর পড়েছিল যে মধ্যবিত্ত এক নায়ক তার স্ব-শ্রেণী ত্যাগ করবার জন্য উন্মুখ, কিন্তু যতবারই সে শ্রমিক শ্রেণী অভিমুখে যাবার উদ্যোগ নেয়, ততবারই তাকে নানা বাধায় ফিরে যেতে হয় স্ব-সমাজে। এই নায়কটির কথা শেখরের মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সে অনেক মধ্যবিত্ত সংস্কারকে ঘৃণা করে, যদিও সে একে সবটা অতিক্রম করতে পারে নি। একেবারে মজুর হওয়াও এখন তার পক্ষে কঠিন। সুতরাং সে এক মধ্যবর্তী প্রাণ—বিড়ম্বিত ত্রিশংকু।

একবার শেখর এক ভারী নেতাকে তার এই সমস্যার কথা

বলেছিল। নেতা মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে বললেন, 'সাধনা করো। অমনিতে কি হয় ?'

নেতাটি মুখস্থ পড়া দেওয়ার মত করে বলল। অনেকের কাছে বোধহয় এ মুখস্থটা পড়া দিতে হয়। তাই ভাবতেও হয় না। শেখরের সময় লেগেছিল বুঝতে যে নেতাটি নিজেও সাধনা করেন নি। পরে সন্দেহ হয়েছে, তিনি এ সমস্যাটা অনুভবও করেছেন কিনা। আর নিজেকে মূর্খ ভেবেছে শেখর। কার কাছে কী যে খুঁজতে গেছে ? মনে খুব কাঁচা ছিল সে। নইলে মোল্লার কাছে আল্লার খবর পেতে যায় ! গীর্জার নিকটতমই ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরতম। গীর্জার ঘণ্টা শুনেই ছুটে গিয়েছিল সে—যদি কিছু সমাধান মেলে। সব নেতারই ঘণ্টা আছে। ঘণ্টা ছাড়া নেতা হয় না।

'কি ভাবছ ?' জিজ্ঞেস করল রমজান।

'ভাবছি, তোমার কথা হয়তো সত্যি।'

'চলি। তুমি তো আজ যাচ্ছ না।'

রমজান চলে গেল। ও রাজমিস্ত্রি হয়ে যাবে। রক্তমাখা ডেলা পাকানো দেহ। বড় ভাই। বাপজান। বাবা। দাদা। চন্দনা। চন্দনার মনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ আছে, এবং সে কথা সে অস্বীকার করে না। বরং বলে যে এ বিষ কম বেশি সবার মধ্যেই আছে। চন্দনার মধ্যে থাকাটা স্বাভাবিক—ব্যক্তিগত কারণে। কিন্তু অন্যরা —যারা অতটা প্রত্যক্ষভাবে আঘাতপ্রাপ্ত নয় ? সে নিজে ? চন্দনার বা অন্যদের সঙ্গে তর্কের সময় সে স্বীকার করতে চায় না তার সাম্প্র-দায়িকতার কথা। কিন্তু সে জানে, এটা আছে। তত্ত্বগত ক্ষেত্রে হয়তো সে অতিক্রম করেছে, কিন্তু সংস্কারের ক্ষেত্রে পুরো পারে নি। রমজানকে সে একান্ত আপনই মনে করে, কিন্তু তার বোন যদি রমজানকে বা অনুরূপ কাউকে বিয়ে করে, তবে তার মনের পুরোটা অংশ সায় দেবে না। সে সুসভ্য সুজনের মতো মেনে নেবে হয়তো, কিন্তু—অথচ সেও ধর্ম মানে না। কি হাস্যকর অসঙ্গতি !

তার ছাত্রজীবনে একবার সে সর্ব-ভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে গিয়েছিল হায়দ্রাবাদে। সেখানে একজন খুব শ্রদ্ধেয় মুসলমান নেতা বলেছিলেন, 'আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা আছে। প্রতি মুহূর্তে আমাদের তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।' যে নেতাকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত তাঁর মুখের এই কথা অত্যন্ত 'শকিং' মনে হয়েছিল। কথাটার অর্থ, তার মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা আছে। শেখরের তারুণ্যের আবেগে ইচ্ছে হয়েছিল গিয়ে বলে, 'না, সবার মধ্যে নেই। আমার মধ্যে নেই।' ভাগ্যিস বলে নি। তারুণ্যের উচ্ছ্বাসকে পেরিয়ে এসে তবে তাকে আবিষ্কার করতে হয়েছিল নিজেকে, অপরকে এবং ঐ নেতার উক্তির সত্যতাকে।

এই চটকল ইউনিয়নে কাজ করতে আসার রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও তার একটা ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল। এই চটকলে প্রচুর সংখ্যক মুসলমান শ্রমিক কাজ করে। এদের সংস্পর্শে আসতে চেয়েছিল সে। সাম্প্রতিক কালের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি দেশবিভাগ তার মনে গভীর দাগ ফেলেছিল। এই বিভেদের মূল কারণগুলোকে সে দিনের পর দিন অনুসন্ধান করেছে—ইতিহাসে, সাহিত্যে, লোকব্যবহারে। সে-কারণগুলোকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা দরকার—উৎপাটন করবার জন্যেই। শুধু উচ্ছ্বাসবশে একবার 'ভাই ভাই' না বলে লোকজীবনের মূল খুঁজে দেখা দরকার কোথায় কতটা ঐক্যসূত্র আছে; সেই ভিত্তির ওপর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাহায্যে জাতীয়জীবনকে নতুনভাবে সংগঠিত করবার প্রয়োজন আছে। এইজন্যে সে মুসলমান জনজীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে চেয়েছে কিন্তু সে জানে যে সে মোটেই খুব ভেতরে ঢুকতে পারে নি। ব্যর্থ সে। ব্যর্থ হচ্ছে প্রতিদিন। ব্যর্থতার পরিধি বাড়ছে—সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্র থেকে ভাষার ক্ষেত্রেও তা এখন বিস্তৃত। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রয়োগ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অংশত ব্যর্থ হয়েছে—অন্তত সাময়িক ভাবে। আর জাতীয় ক্ষেত্রে? না থাক এসব চিন্তা। সকল

মানুষের কাছে চরম আশাবাদ করে যে মানুষটা সে ব্যর্থতার আঘাতে আঘাতে পরাজিত, হতাশাগ্রস্ত। যে সবাইকে সংহত করবার প্রয়াসে সক্রিয়, সে নিজের ভেতরকার আত্মবিরোধে শতধাদীর্ণ। নিজের মধ্যেই এক একটা বিষয়কে নিয়ে সে কলহাকীর্ণ। সেই ভাঙ্গা-চোরা মনটাকে সে গুটিয়ে গুছিয়ে তুলতে পারছে না। সব কাজই সে করছে অভ্যাস বশে, নয়তো কর্তব্যবোধে। প্রাণ নেই তাতে। অনুপ্রেরণা না থাকলে কাজ একদিন বোঝা হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু সে যে বোঝাকে ফেলে দিতেও ভয় পায়—তাহলে গোটা জীবনটায় হঠাৎ যে শূন্যতা খা-খা করে উঠবে, তাকে পূর্ণ করবে কী দিয়ে।

অথচ এ রকম ভাবে চলে না! শেখরের অন্তত চলে না। তার আত্মবিরোধ সম্পর্কে সে অত্যন্ত সচেতন, তাই প্রতি মুহূর্তের যন্ত্রণায় সে আর্ত। সে অন্তত নিজের সব বৈপরীত্যের মীমাংসা করে একটা অনুপ্রেরণার সুরে তার জীবনকে সাজিয়ে তুলতে চায়। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই তার কাম্য। কিন্তু সে পেরে ওঠে নি। রুমীর ক্ষেত্রে সে ব্যর্থ। বহুবার সে নিজেকে বুঝিয়েছে যে এ ব্যর্থতার দায়িত্ব তার নয়। রুমীর ঘাড়ে দোষটা চাপিয়েও সে সম্পূর্ণ তৃপ্তি পায় নি। যে কোন ব্যর্থতাই তাকে পীড়িত করে। মানুষ সাফল্যের জন্যেই জন্মেছে, ব্যর্থতার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে নিজে,—এই জাতীয় একটা চিন্তা তার মধ্যে আছে। সুতরাং ব্যর্থতা তার কাছে প্রায় অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত।

রুমীর পর যে সব মেয়ে তার নিকট-সান্নিধ্যে এসেছে, তাদের সে একটু আশংকার দৃষ্টিতে দেখেছে—যেন এরা এক একটি ব্যর্থতার প্রতীক। তাছাড়া রুমী যেন তার চোখ খুলে দিয়েছিল—সে অল্প মিশলেই মেয়েদের মানসিক পরিধিটা মোটামুটি পরিমাপ করে ফেলতে পারত। কেউ রঙ্গীন পালক বিস্তার করেই খুশী, কেউ নিছক নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষী, কেউ থলথলে উচ্ছ্বাসের পলকা পিরা-মিড, কেউ বা স্বর্ণচূড়া-পিয়াসী, কেউ সাদা-মাটা ভাল মানুষ,

ছু-একজন বুদ্ধিমতী কিন্তু পুরুষ-বধের বাইরে অবশ্য কোথাও বুদ্ধির ব্যবহার করে না। কারুর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ নেই। এমন কি তাদের সঙ্গে তার কিছু সময় বেশ ভালই কেটেছে। কৌতুক আর কৌতূহলের চোখে সে এদের দেখেছে এবং উপভোগই করেছে। আত্মদ্বন্দ্ব, ব্যর্থতা ও গভীর প্রত্যাশা মিলিয়ে যে সামগ্রিক জীবনাবেগে সে কম্পিত, তাকে কেউ ধারণ করুক এ সে চেয়েছে। কিন্তু খুঁজে পায় নি—ছুর্ভাগ্য!

তারপর চন্দনার সঙ্গে দেখা। ঠিকমত শেখর ওকে দেখেছে হাসপাতালে। শেখরের বুড়ো বয়সে একদিন সখ হলো ফুটবল খেলবার। পাড়ায় প্রাক্তনদের সঙ্গে নবীনদের খেলা। পাড়ার ছেলেরা তাকে ধরল প্রাক্তনদের হয়ে খেলবার জন্য। শেখর নামল। এবং ডান পায়ের হাঁটুটি ভাঙ্গল। হাসপাতালে থাকতে হলো দিন কুড়ি। এখানে চন্দনার সঙ্গে দেখা। তার শেখরদের ওয়ার্ডে ডিউটি পড়েছিল। ছুজনেই আশ্চর্য হয়েছিল!

চন্দনা বলল, 'কবে বেরিয়েছেন জেল থেকে?'

'অনেক দিন। কয়েক বছর।'

'খোঁজ নেবার চেষ্টা করেছিলাম, পাই নি।'

'আমারও ঠিক তাই। যে ডাক্তার বন্ধুটির কাছে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম সে বিলেতে। তার ঠিকানা জানি না। তার ঠিকানা যোগাড় করে তাকে চিঠি লিখলাম। বহুদিন বাদে জবাব এল যে সে তোমার বর্তমান কর্মস্থল কোথায়, বলতে পারে না।'

'যাক ও কথা, কেমন আছেন এখন?'

'যথাপূর্বং।'

'সারাদিন কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে কী ভাবেন?'

'মানুষের হাড়ের ভঙ্গুরতার কথা ভাবি।'

'বুড়ো বয়সে এ খেলার সাধ হলো কেন?'

'নিয়তি।'

'নিয়তি লোকটি তো সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। কথা নেই বার্তা নেই, হাড়টা দিলে ভেঙ্গে।'

'কথাবার্তা বলে ভাঙ্গতে এলে কি আমি ভাঙ্গতে দিতাম নাকি ?'

এইখানেই শেখর চন্দনাদের বাড়ির দুর্ভাগ্যের সব খবর বিশদ-ভাবে শুনল। চন্দনা বলল, 'আপনার খবর বলুন। বিয়ে করেছেন ?'

'হ্যাঁ, ওটা চুকিয়ে রেখেছি।'

'ছেলেমেয়ে ?'

'একটি ছেলে।'

'আপনি ভাল হলে একদিন যাব বৌদি আর বাচ্চাকে দেখতে। বৌদি তো একদিনও আসেন নি। অসুস্থ ?'

'বোধ হয় সুস্থ, উনি জানেন না যে আমি অসুস্থ !'

'মানে ?'

'চন্দনা, আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে।'

হঠাৎ দুজনেই চুপ করে গেল।

শেখর বলল, 'চুপ করে থাকবার দরকার নেই।'

'কে ডিভোর্স চেয়েছিল ?'

'দুজনেই, বনে নি আমাদের। ভুল লোক বেছেছিলাম আমরা দুজনেই।' তখন দিন কুড়ি খুব কাছাকাছি ছিল শেখর আর চন্দনা। দুজনেই নিজেদের উজাড় করে কথা বলেছিল। চন্দনা যে তার প্রায় অপরিচিত—বলতে গেলে এইবারই সবে পরিচয় হলো—একথা মনেই হয় নি শেখরের। আর চন্দনা যেন অনেক দিন পরে একটা অবলম্বন পেয়েছিল। যেন তারা খুব ছোটবেলার চেনা—অকস্মাৎ কয়েক বছর দেখা হয় নি। চন্দনাদের বাড়ির সব ঘটনা—ছোঁট থেকে বড়—জেনে ফেলল শেখর। জানল চন্দনার দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস। যে মৃত্যুর পটভূমিকায় তারা কোলকাতা নামক বিদেশে যাত্রা করেছিল তার খুঁটিনাটি সব শুনল শেখর। আর বললও। কতদিন যেন সে কথা বলে না। সত্যি তাই। এমনিতেই

সে একটু চাপা। ঠিক লোকটি না পেলে মুখ খুলতে না খুলতেই বন্ধ হয়ে যায়। তার জীবনের গভীর কথাগুলোও রুমী ভাল করে শোনে নি। আর তার তুচ্ছ বিষয়েও চন্দনার গভীর আগ্রহ। কোন সূক্ষ্ম সূত্রে সে বাঁধা পড়ছিল তা সে জানেও নি। মেয়েদের কাছে গেলে তাদের মুখভঙ্গী ও চরিত্রভঙ্গী 'স্টাডি' করা ছিল তার একটা পেস্টাইম্। এর জন্যে যে বিচ্ছিন্নতা ও সতর্কতা প্রয়োজন তা জন্মসূত্রেই তার খানিকটা আয়ত্তে ছিল। কিন্তু এখানে এই চন্দনার কাছে সে নিজেকে ভুলে গেল। এক-আধ সময় যখন মনে হয়েছে কথাটা ঐ সদা-সতর্কতা ফিরিয়ে আনতে চায় নি। প্রতি মুহূর্তের সতর্কতা মনকে পীড়িত করে, ক্লান্ত করে। সে ভেতরে ক্লান্ত নিঃসঙ্গতা দিয়ে মোড়া ছিল। যত্র-তত্র এটা ঘোচবার নয়। দ্বন্দ্ব, হতাশা, ব্যর্থতা, উচ্চ আদর্শ—এই সব নানা বিপরীতমুখী শক্তির আঘাতে মন তার ভেঙ্গে টুকরো হয়েছিল। তাকে সংহত করে একটা সুরকে বাজিয়ে তোলবার প্রেরণা লাভ করল শেখর। কোন কর্মের বা আদর্শের বেদীতে সর্বাত্মক আত্মদান যেন এ যুগের মানুষ পারে না। তার একাংশ সামনে চলে, অন্য অংশ পিছনে টানে। এমন কি প্রেমের ক্ষেত্রেও ঘটে সেটা, কিন্তু অন্তত শেখরের জীবনে যেন এটা না ঘটে। ঐ কুড়ি দিন কি আশ্চর্য সুরে তার জীবনের বাঁশী বেজেছিল! সেবায়, শুশ্রূষায় আর কোমল এক ব্যক্তিগত সম্পর্কের আবহাওয়ায় চন্দনা যেন তাকে ঘিরে ছিল। সে নিশ্বাস নিত সেই চন্দনার আবহাওয়ায়। ঘুমোত চন্দনার জগতে, জাগত চন্দনর দিকে চোখ মেলে। আর ঘুম ও জাগরণের মধ্যেকার জায়গাটায় চন্দনার অস্তিত্ব যেন ছড়ানো ছিল।

যখন চন্দনার নাইট ডিউটি পড়ত, এবং যদি খারাপ রোগী না থাকত, তাহলে শেখরের বেডের পাশে টুলে বসত সে। বহুদিন অনেক রাত অবধি গল্প চলত। মাঝে মাঝে উঠে চন্দনা তার 'সন্তান'দের এক একবার দেখে আসত। চন্দনা ঢাকার অতীত

কাহিনী বলতে ভালবাসত। ঢাকার স্মৃতি তার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। শেখরও শুনতে শুনতে ফিরে যেত তার কৈশোরে, শৈশবে, *পূর্ববঙ্গের কাদা-মাটি-জল আর অনন্ত আকাশ ও অসীম শস্যপ্রান্তরের* মধ্যে, যেখান থেকে সে চিরদিনের মত নির্বাসিত হয়ে গেছে। ডিউটি শেষ হলে শেখরের কাছে এসে হেসে বলত, 'চলি।'

পরের দিকে শেখর একটা চাকা-ওয়ালা হেলানো চেয়ারে বসে চলে আসত বাইরের বারান্দায়। চন্দনা ঠেলে আনত চেয়ারটা। বাইরে তাকিয়েই শেখরের মনে হত কত দিন বাইরে যাই না। চন্দনা বলত, 'বাইরে যাওয়ার জন্য উতলা!'

'হব না! কত কাজ রয়েছে।'

'অত যার কাজ সে বুড়ো বয়সে খেলতে যায় কেন?'

'তখন বুঝি নি।'

'কয়েক দিন ধরে খালি যাই-যাই করছেন।'

'এতদিন শুধু শুয়ে বসে—'

'ভাল হলে তো নিশ্চয়ই যাবেন। তার জন্য অত কেন? যেন জলে পড়েছেন।'

'তুমি বুঝতে পারছ না চন্দনা।'

'খুব পারছি। আপনি বসুন। ঐ ওদিকে আমার ডাক পড়েছে।'

'সন্তান?'

'হ্যাঁ। আমার তো একটি নয়?' চন্দনা চলে যেত। শেখর ঐ মাঠের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত। মাঠের ওপরে হাসপাতালের ধোপারা কাপড় কেচে মেলে দিয়েছে—রোদ্দুর পড়ে আসছে দেখে তুলছে এখন। হাসপাতালের কুলিরা কয়েকজন চলেছে দল বেঁধে। রোগীকে কেউ দেখতে আসছে, কেউ ফিরে যাচ্ছে। নার্সরা ব্যস্ত-ভাবে যাতায়াত করছে। সর্বত্র কাজের স্রোত। শেখর শুধু একা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। কবে সে বেরোবে। কত কাজ অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে!

কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে চন্দনা, শেখর টের পায় নি।

'কি ভাবছেন ?'

'ভাবছি—জীবনের স্রোতের বাইরে আমি।'

'যাবেন তো শীগগিরই। এত অস্থির হচ্ছেন কেন ?'

'চন্দনা, আমি যখন চলে যাব তখন তোমার একটু ফাঁকা লাগবে, তাই না ?'

'না। আপনি যাবেন আমাদের বাড়িতে।'

'যাব।' একটু চুপ করে থেকে শেখর বলল, 'চন্দনা, সামনের মাঠ পেরিয়ে ঐ যে বড় লাল বাড়িটা—ঐটে তোমাদের কোয়ার্টার, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'কবে কবে তুমি বাড়ি যাও ?'

'ছুটি যেদিন থাকে। আর এক-আধদিন, যেদিন বিকেলে অফ্ থাকি।'

'যেদিন বাড়ি যাও না—?'

'সেদিন বন্ধুদের সঙ্গে বেরোই। টুকিটাকি কিনি। ঘুরি। সিনেমা দেখি এক-আধটা। কিন্তু আমার ভাল লাগে না।'

'কী ভাল লাগে না ?'

'নার্সিং আমার ভাল লাগছে না।'

'কেন ?'

'তা ঠিক জানি না।'

'অন্য কিছু কর।'

'কী করব ?'

'কী ইচ্ছে করে ?'

'পড়তে আবার।'

'তাই কর।'

'পাগল। বাড়িতে না খেয়ে মরবে।'

'সে একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয়। সংসার আমার ওপর।'

'তুমি আগে তোমার মন ঠিক কর।'

'আমার মন ঠিক আছে।'

তারপর চাকরী ও পড়া দুটোই চালিয়েছিল চন্দনা একসঙ্গে। মা-র মত ছিল না পড়ায়, বাচ্চাদের অনশন তিনি দেখতে চান নি। বাচ্চাদের অনশন করতে হয় নি। শেখর কিছু সাহায্য করতে চেয়েছিল। চন্দনা নেয় নি। দুটোই করেছে সে। পড়ার সঙ্গে প্রথমে নার্সিং, পরে শিক্ষকতা।

আসবার আগের দিন রাতে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল শেখরের। সেই ছোটবেলার বন্ধুদের বিদায়ের মুহূর্তের কান্না-কান্না মনটা হঠাৎ ফিরে এসে বুকের মধ্যে চেপে রইল। মনে হলো, কাল থেকে তার অন্য জীবন—সে জীবনে চন্দনা কোথায়!

॥ রুমী ॥

ওঃ, উনি এলেন ছেলের ওপর দরদ দেখাতে। দরদ নয়, আদিখ্যেতা। যেন উনি না হলে আর ছেলেকে দেখবার কেউ নেই। ওসব কি আর আমি বুঝি না? আসলে উনি এসেছেন বাবাগিরি ফলাতে। ওটা এখন কয়েক বছর মুলতুবী রাখলেই তো হয়। তারপর ফলিয়ো, ফলাবে তা জানি। চোখ দেখলে বুঝতে পারি তোমার পেটে কী আছে। তোমার সঙ্গে এত দিন ঘর করলাম। তোমার হাড়হদ্দ জানি। তুমি টোপনের ওপর তোমার অধিকারটা বাজায় রাখতে চাইছ। টোপন যে আমার কাছে আছে তা আর সহ্য হচ্ছে না। হিংসেয় ফেটে মরছ যে! কিন্তু তাতেও তো রাখা যাবে না শুনছি। হারব নাকি আমিই। এ কী রকম নিয়ম বুঝি না। ছেলের উপর বাপের বরং কর্তৃত্ব থাকা উচিৎ নয়। কী তাদের দাবী? কী করে তারা? একটি সন্তানের ক্ষেত্রে তাদের দান নগণ্য। অথচ তারই জোরে তারা সবটুকু গ্রাস করে। আর মা দেহের মধ্যে ও বাইরে সন্তানকে লালন করে— তারই দেহাংশ দিয়ে। সন্তান তারই অংশ। সন্তান তারই, কিন্তু পুরুষের সমাজ নিয়ম করেছে উলটো। সেই উলটো নিয়মটার ফাঁদে আমায় তুমি ফেলতে চাও জানি। আর তুমি যে জিতে বসে আছ তাও জানি। ছেলের ওপর খুব দরদ দেখানো হয় আজকাল— ইদানীং এটা বাড়ছে ক্রমাগত। এত বাড়ছে যে আমি ভয় পাচ্ছি। তুমি যে আমায় সরিয়ে ঢেকে দাঁড়াবে তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আমার ভাল লাগে না তা। যন্ত্রণা হয়। সব সময় কষ্টটা চলতে থাকে। সর্বদা একটা 'হারাই হারাই' ভাব। এই নিত্য আশঙ্কার মধ্যে বাঁচা যায় না। তাই আমি চলে যাচ্ছি টোপনকে নিয়ে।

ইণ্টারভিউটা নিছক নামে। কাজ আমার প্রায় ঠিক হয়েই আছে। আর আমি ফিরব না! তোমাকে যেভাবে বলেছি কথাটা মিথ্যে। আমি যাচ্ছি বরাবরের জন্যে। ওখানে থাকব আমি ও টোপন। তুমি নও, তোমার চিহ্নমাত্র থাকবে না সেখানে। তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে টোপনের মন থেকে। টোপন ঠিক সেই রকম হয়ে যাবে, যখন ও অজাত ছিল, ছিল আমার দেহের আধারে, যখন আমার নিশ্বাসে ও নিশ্বাস নিত, আমার বেদনায় ও বেদনা পেত। অথবা হয়ে যাবে সেই দু'এক বছরের টোপন, যখন আমি ছাড়া ও ছিল না।

টোপনটা আজকাল বাপের খুব ন্যাওটা হয়েছে; ও যখন তোমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন আমার বুকটা কড়কড় করতে থাকে। আমি ঐ দৃশ্যের মধ্যে আমার শূন্য ভবিষ্যৎকে দেখতে পাই, তোমরা দুজনই মাত্র আছ ভবিষ্যতে, আমি নেই! টোপন ভুলে যাবে আমাকে! নিদারুণ কষ্টকর সেই দিন। তার চেয়েও কষ্টকর হবে যখন ও আমায় খুব খারাপ চরিত্রের লোক বলে ধরে নেবে, ঘৃণা করবে আমাকে। কিন্তু সে ও করবেই। সে অবস্থা দুঃসহ। সে সন্তান তখন আমার কাছে মৃত। না, মৃতের চেয়েও বেশি। মৃতের তবু করুণ মধুর স্মৃতি থাকে। না, আমি তা হতে দেব না। নিয়ে যাব টোপনকে তোমার কাছ থেকে। তোমাকে ভুলে যাবে ও আমার কাছের এই বছরগুলোতে। তুমি ওর কাছে একেবারে অচেনা হয়ে যাবে। যেদিন তুমি ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, সেদিন তুমি ওর কাছে অপরিচিত একজন ভদ্রলোক মাত্র, আমি ওর সব। তোমার কাছে যখন তুমি ওকে রাখবে, তখনও আমার কাছে পড়ে থাকবে ওর মন। দিনে ও আমায় ভাববে। রাত্রে ও আমার জন্যে কাঁদবে। আর তুমি ওকে আটকে রেখেছ বলে তোমার ওপর রেগে থাকবে। তোমাকে মনে করবে পাহারাদার। ঐ সম্পর্ক থাকবে তোমার সঙ্গে। ওর ঘর থাকবে আমার ঘরে। ওর মন সেই ঘরের মায়ায় বাঁধা থাকবে। তারপর

একদিন যখন ওর বন্দী-দশা ঘুচবে, ও সাবালক হবে, সেদিন ও চলে আসবে ছুটে আমার কাছে, তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না ; সেই বড় টোপনকে বিয়ে দিয়ে আমি আমার সংসার পাতব।

যাব। আজ। তাই বাক্সটা সাজাতে বসেছি। কি নেব? বাক্স সাজাতে আমার ভাল লাগে। বাক্সের মধ্যে অনেক জিনিষ। তারা অনেক দিন আঁকড়ে ধরে আছে। বাক্সের মধ্যে অনেক দিন। ডালা খুললেই একে একে বেরিয়ে আসে দিনগুলো। গন্ধ। ন্যাপথলিনের। কাপড়ের। কাপড়—কটা নিই! কোন্ কোন্টা? নীল শাড়ী। নীল রংটা আমি পছন্দ করি। বেনারসী। স্তী। লাল সিল্ক একটা। গোলাপী জর্জেট—এটা বিয়েতে ছোট মামা দিয়েছিলেন। বিয়ের সময়কার এবং বিবাহিত কালের অনেক শাড়ী আছে। এই চাপা রং-এর শাড়ীটা বিয়ের পরে কেনা। বলতে গেলে শেখরের টাকায়। এটা ফেলে দেওয়া উচিৎ, কিন্তু এত ভাল শাড়ী কোনো মেয়ে ফেলে দিতে পারে! আমি একজন মেয়ে। চাপা রংটা ফিকে হয়ে গেছে—বিবাহিত দিনের স্মৃতির মতই। হোক্, দুঃখ নেই। সম্পর্কটা ভাঙ্গবেই এটা কেন যে আমি আগে বুঝতে পারি নি। বোঝা উচিৎ ছিল। আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল মেয়ে বলে গর্ব করতাম। লোকেও বলত। তাও এ বিপত্তি ঘটল। সব দোষ নাকি আমার—শেখর তাই মনে করে। কি দোষ আমার! আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে। আর দশটা মেয়ের মত আমিও সমাজে যশ, অর্থ, মান, প্রতিপত্তি চাই। স্বামীর এগুলো থাকা উচিৎ, যার নেই তার অর্জনের চেষ্টা করা উচিৎ, যে অর্জন করতে পারে না তাকে কি বলব? অল্প বয়সে আদর্শবাদের মদ খেতে পারো—বয়সকালে যেমন দোষ থাকে কারো কারো। বয়স হলে বিয়ে-থা করলে তা ছেড়ে দিতে হয়। তারপরও যে ওটা নিয়ে পড়ে থাকে সে হয় অ্যাডোলেসেণ্ট, বোকা অথবা অকর্মণ্য। ও হ্যাঁ, রাজনৈতিক নেতারা নাকি আসলে ফাদার কমপ্লেক্সে ভোগে। এতে

ভোগে কিনা জানি না, নেতাদের এক্সপ্লয়টেশেনে ভোগে। একটা সাবালক যদি নিজেকে এভাবে এক্সপ্লয়েটেড হতে দেয় তবে তাকে বোকা বলা অন্যায় নয়। একটা ভাল চাকরী করলে মান খোয়া যায় না মান বাড়ে? সংসার-কর্তব্য কোন্ মানুষটা না করে! স্ত্রী-পুত্রকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখতে কে না চেষ্টা করে? তুমি তার জন্যে কী উদ্যোগ নিয়েছো? কিছু না. তোমার একটা বোকা আদর্শের জন্যে তুমি সবাইকে ভোগাতে পারো? লোকের কাছে কি রকম হেয় হয়ে থাকতে হয়। ধন-সম্পদ গাড়ি বাড়ী তো দূরের কথা, চালচুলো অবধি নেই। আত্মীয়স্বজন জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে পারি না যে আমার স্বামীর কি জীবিকা। রাজনীতিতে তুমি চিরদিন ভলান্টিয়ার হয়ে কাটিয়ে গেলে। তোমার ক্যালিবার কতটা তার প্রমাণ। লিখে বাংলাদেশে ক' পয়সা রোজগার হয় তা সবাই জানে। সেটা লোকের কাছে বলা যায় না। লিখেও বাংলাদেশে লেখকরা গাড়ি বাড়ি করেছে, কিন্তু তুমি সে-দরের লেখক নও। তা হ'লে আত্মীয়বন্ধুরা সবাই তোমার নাম এমনিতেই জানত। তুমি বোধহয় মহাকালের প্রত্যাশায় বসে আছো, থাকো। আমি সাধারণ মানুষ এবং মেয়েমানুষ। সাহিত্য-টাহিত্য আমি বিশেষ বুঝি না। তবে মহাকালের জন্যে বসে থাকার ধৈর্য আমার নেই। মহাকালের সঙ্গে খণ্ডকালের গাটছড়া বাঁধা হলে তাতে বিড়ম্বনা অশেষ—উভয়েরই। তাতে একটাই মাত্র সুবিধে—ডিভোর্স স্যুটে কেউই কনটেস্ট করে না, মিউচ্যুয়ালি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কারণ তখন উভয়েই মোহমুক্ত হয়ে 'পালাই পালাই' করছে।

বাক্সের মধ্যে কতগুলো ছবি। আমার ছবি, ছোটবেলা থেকে —নানা বয়সের! টোপনের ছবিও আছে কতগুলো, তোমার সিঙ্গল ছবি একটাও রাখি নি, কয়েকটা ছবি ছিল তোমার টোপনের সঙ্গে। সেগুলো ছিঁড়ে টোপনকে রেখেছি, তোমাকে ফেলে দিয়েছি। একটা ছবিতে তুমি টোপনকে কোলে করে বসে আছো—এটা

ছিঁড়তে পারি নি, ফেলতে পারি নি। তুমি এখনও এসে যখন টোপনকে কোলে টেনে নাও, এই ছবিটা আমার চোখে ভেসে ওঠে। ছেঁড়া যায় না তুজনকে। ছবিটা আমার জীবন। ছবিটা নিয়ে চল্লাম দিল্লী। ঐ জীবনটা যেন এখানে ফেলে যেতে পারি।

ওঃ, উনি করবেন ছেলের আদর যত্ন! তুমি তো থাকো বাপু সারাদিন মুটে-মজুর নিয়ে। তোমার সময় কোথায়। সেটা 'নেগ্-লিজেন্স্' নয়? সেটা ছেলের পক্ষে খারাপ নয়? আর আমি একটু ভাল খেতে পরতে দিলেই হয়ে গেল—কি? না, 'বিলাসিতা'! আহা, কি বিচার বুদ্ধি! কোন্ মার না ইচ্ছে করে ছেলেকে ভাল তুটো জিনিস দিতে! আমার সামর্থ্য থাকলে কেন দেব না?

টোপন কোথায় গেল? অনেকক্ষণ টোপনের সাড়া পাচ্ছি না।

'টোপন, টোপন। এতক্ষণ কোথায় ছিলিরে? বাইরে দাঁড়িয়ে কি করছিলি? মুখখানা অমন কেন? কি হয়েছে? চোখ তুটো ছলছল করছে কেন? এদিকে আয় তো। দেখি, গা দেখি তোর। ওমা, এযে দিব্যি গা গরম। এ ছেলেটা আমায় জ্বালালে! এই জ্বর নিয়ে রোদে দাঁড়িয়েছিলি কেন?

'কি ভাবছিস রে টোপন! বাবার কথা! আয়, আমার কাছে আয়। বাবা এত কি ভাল রে? আমাকে তোর ভাল লাগে না? কেন? আমি যে তোর জন্য এত করি তাও নয়? আমি যে তোকে পাওয়ার জন্য মরে যাচ্ছি। আয়। একেবারে আমার মধ্যে চলে আয়, সেই তোর জন্মের আগের মত—আমার বাইরে তোর আর কিছু থাকবে না। টোপন, আয়। আরো কাছে আয়। টোপন, আমার চোখে জল আসছে। আমার কেউ নেই তুই ছাড়া, টোপন, আমি কাঁদছি।'

॥ শেখর ॥

রোদ চড়ে গেছে। রাস্তার পাশের অতিকায় প্রাসাদগুলো তাদের ছায়া নিজের মধ্যে সংহত করে নিয়েছে। এখন যদি কেউ ঐ প্রাসাদের ওপর থেকে নিচে তাকায় তবে সে দুই পাহাড়ের খাতের গভীরে সাদায় কালোয় মেশা একটা স্রোত দেখতে পাবে। রোদে জ্বলছে রাস্তাটা। সকালের সোনা-রোদ নয়। দুপুরের ধারালো ইস্পাত-রোদ।

শেখর ঐ স্রোত থেকে একটা পাহাড়ের গহ্বরে ঢুকে পড়ল। দীপাদের বাড়ি। শেখরের বন্ধু ও সহপাঠিনী দীপা। অক্ষয়-যৌবন নিয়ে যেন সে এসেছে। আজও—শেখরের সমান বয়সেও—সে দীপ্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় তার নাম রটেছিল—'উর্বশী'। তখনও মিস ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়-শ্রী নামের উদ্ভব হয় নি। রক্তাভ রং। মাথার চুলগুলো শ্যাম্পুর প্রভাবে একটু উড়ু-উড়ু। মাথায় অনেক বাঙ্গালী ছেলের চেয়ে উঁচু। ফিগারে যে কোন মেয়ের ঈর্ষার পাত্রী। আগুন ছড়াতে ছড়াতে সে যেত আশুতোষ বিল্ডিং-এর করিডর দিয়ে। অবশ্য দাহ প্রশমনের উদার হস্ত ছিল তার। খুব কম লোককে সে নিরাশ করত। কিন্তু আশ্চর্য, দগ্ধ এবং প্রশমিত লোকেদের কারুর সঙ্গে তার দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক হয় নি। এদের কেউ তার বন্ধু হয়ে থাকে নি। তারা এসেছে, গেছে। কিন্তু তার বন্ধু ছিল। কয়েকজন ছেলে ও মেয়ে। সেখানে সে সহজ ছিল, আন্তরিক ছিল। পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস ছাড়বার পর ভেঙ্গে গেছে সে বন্ধুদল। বিবাহ, সংসার ও জীবিকা দাঁড়িয়ে গেছে পরস্পরের মধ্যে দেওয়ালের মত। শুধু কেমন করে যেন শেখরের সঙ্গে বন্ধুত্ব তার আজও টিঁকে গেছে। একদিকে সম্পর্কটা খুব

শিথিল—একেবারে নেই বললেও ক্ষতি হয় না। অথচ দীপার বহু একান্ত কথা শুধু শেখরই জানে। নিয়মিত কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু দেখা হলে উভয়েই নিজেদের অভিজ্ঞতাটা যেন অপরকে বলে একটু যাচাই করে নেয়। বিশেষত দীপার পক্ষে এটা একটা যেন প্রয়োজন হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। এবং এ প্রয়োজন দীপার ক্রমাগতই বাড়ছে—অনুভব করতে পারে শেখর। সেই কৈশোরে জীবন দেখতে বেরিয়েছিল দীপা। তখন উপভোগই ছিল জীবন। আজ সে ভাবে। দুর্নাম তার সারা কোলকাতায় রাষ্ট্র। দীপা অবশ্য তাতে ভ্রুক্ষেপ করে নি কোন দিনই। দীপার সঙ্গে এমন কি শেখরের নামও বহু মহলে যুক্ত হয়ে রাষ্ট্র। ছাত্রজীবনের গোড়ায় এ সব কথায় তার কষ্ট হত, এখন হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দীপার বাড়ীতে আসতেই সে বলল, 'কি কলির কেষ্ট, এবার এত দেরী যে!'

'ঐ নামটা বলিস না।'

'তবে কি বলব?'

'পুরুরবা।'

হাসল দীপা: 'এত দেরী কেন রে!' সাধারণ ভাবেই এ প্রশ্ন করে। কোন অভিযোগ করে না। কোন নির্দিষ্ট দিনের প্রত্যাশা থাকে না। কিন্তু যেদিনই দেখা হোক আনন্দ পায়। 'কি করছিলি? দেশোদ্ধার? দেশ যে সবটুকুই উদ্ধৃত হয়ে গেল। তোর ছেলেটার জন্যে একটু রাখ। নইলে পরে ওরা কি করবে?'

'এলাম এতদিন বাদে। চাঁদ, ফুল, মলয়, লুচি, মাংস, রসগোল্লা—এই সব বলবি, তা নয় রাজনীতি'

'এই ভাদুরে রোদে চাঁদ ফুল বা মলয় আনা একটু কঠিন হবে! বরং শেষেরগুলো—'

'ব্যস, ব্যস। ঐতেই হবে। কলিযুগে ওই যথেষ্ট। ঐতেই আমি কোনো রকমে কষ্টে চেষ্টে—'

'পাদ্য-অর্ঘ প্রস্তুত।'

শেখর জামাটি খুলে হাত মুখ ধুয়ে বসল। দীপা তোয়ালে দিয়ে বলল, 'এই নে। অন্য কেউ হলে আঁচলটা দিতে পারতাম।'

'হায়! ফ্যানটার স্পীড একটু বাড়িয়ে দে। হাতপাখার বীজন না হয় থাক অন্য কারো জন্যে।'

'দিলাম।'

'এ যে ঝড়।'

'বুড়ো হাড়ে একটু হাওয়া লাগুক।'

'বন্ধুরা আমাকে তাদের মধ্যে তরুণ মনে করে।'

'তার মানে ঘাটের মড়ারা তোর বন্ধু।'

'ঐ রকম করে আঘাত করিস না, কারণ দূত অবধ্য। এবং আমি আজ দূত?'

'হায়, কলির কি হাল? স্বয়ং কেষ্ট পিওনের চাকরী করছে। তা কিসের দূত?'

'কান্তি ও সুবর্ণার।'

'ওদের আবার কী হলো? এক জোড়া বিয়ে নাকি?'

'না। বিয়ে একটাই। পুনর্বিবাহ।'

সত্যি! বল শুনি। ইণ্টারেস্টিং।'

খেতে খেতে বলল ঘটনাটা। আমন্ত্রণও জানাল।

'স্ট্রেন্জ্!'

'কেন, স্ট্রেন্জ্ কেন?'

'আরে, আমি একবারই একটা লোকের সঙ্গে পুরো মেলাতে পারলাম না, আর ও দু' দুবার একটা লোকের সঙ্গেই ঘুঁটি মিলিয়ে দিলে? কেরামতি আছে। সুবর্ণার সঙ্গে দেখা হলে মন্তরটা শিখে নিতে হবে।'

'মন্তর শিখলেই কি তুই প্রয়োগ করতে পারবি?'

'কেন, পারব না কেন?'

'তুই যে অন্য মন্ত্রের সাধক। সেই যে তোর লোভনীয় অংশ ও লোভনীয় মুহূর্তের তত্ত্ব।'

'তুই আরো অনেক দিন ঠাট্টা করেছিস এ কথাটা নিয়ে। কিন্তু আমার ধারণা, একটা লোকের সবটুকু এবং তাকে সবসময় ভাল লাগা সম্ভব নয়।'

'হয়তো নয়। তবে এ তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে বিবাহ-প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতে পারে একমাত্র সুন্দরী মেয়েরাই।'

'আমি তাহলে সুন্দরী! চোখ ঝিকিয়ে লঠল দীপার।

'অন্তত বহু-বাঞ্ছিতা।'

হাসল দীপা : 'অর্থাৎ আমি যেন কোন সময় বিয়ে করতে পারি, এই তো? এ বয়সে এ সব কথা শুনলেও আনন্দ হয়। কিন্তু তোর কথার সমস্যাটা মেনে নেওয়া হয়েছে। এক্‌জন স্বল্পবাঞ্ছিতা মেয়ের কাছে এ সমস্যাটা থাকলেও সে এতটা রিস্‌ক্ করতে রাজী নয়। বাকী জীবনটা স্টেক করতে সে চায় না। যতটুকু পেল ঐটুকুতেই—তৃপ্ত না হোক—জীবিত থাকবার চেষ্টা করে। আমি জীবন'ধারণের সমস্যাটা ভুলি নি। যে লোক, ধর, খেতে পাচ্ছে না, তার কাছে খেয়ে বাঁচাটাই প্রধান সমস্যা। খেয়ে বেঁচে আছে যে লোকটা—আমি মনে করি সব লোকেরই এ মৌলিক অধিকার আছে—তারই সমস্যার কথা বলছি আমি।'

'একালে সব লোক তার পছন্দ-অপছন্দগুলোকে ক্রমাগত শানিয়ে এমন সূক্ষ্মাগ্র করে তুলেছে যে পাশাপাশি এলেই খোঁচা লাগে।'

'কথাটা তোর মুখে আগেও শুনেছি। কিন্তু এ যায়গা থেকে ফেরার পথ দেখি না।'

'সবায়ের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে—' বলতে বলতে থেমে গেল শেখর। তার মনে পড়ল সেই ভারী নেতার 'সাধনা কর' শীর্ষক কথামৃত। প্রায় তারই মত একটা শুষ্ক বক্তৃতার সূচনা

করে ফেলেছে সে। দীর্ঘকাল রাজনীতি করার ফল বোধ হয় এটা। তাড়াতাড়ি লঘু করবার অভিপ্রায়ে বলল, 'অন্তত একটা লোকের ক্ষেত্রে মিলিয়ে নেওয়া দরকার।'

'মিলিয়ে নিতে মন সায় দেয় না। মিলে গেলে পরম ভাগ্য বলে মানব।'

'তাহলে তোর আইবুড়ো নাম ঘুচল না। মানুষ পূর্ণ হয় না।'

'হয়ত হয় না। কিন্তু আমার তৃষ্ণা যে ঐ আকাশের চাঁদের জন্যই।'

'আর পূর্ণ মানুষ এলেই যে তোকে পছন্দ করবে তার কি মানে? সে তো ন্যায়সঙ্গতভাবেই পূর্ণ নারীকে কামনা করে।'

'সে ভয় আছে। আমি তো জানি আমি কত অসম্পূর্ণ।

'তাহলে বিয়ে ব্যাপারটা তুলে দিতে হয়।'

• 'প্রায় তাই তাই। এক ধরনের কম্প্যানিয়নশীপ থাকবে। ছাড়া-ছাড়া, আলগা ভাল-লাগার মুহূর্তগুলোকে নিয়ে গাঁথা।'

'অর্থাৎ দায়িত্ব নেবে না।'

'আনন্দময় দায়িত্ব নেব। শুষ্ক দায়িত্ব বোঝা বিশেষ—তা বইতে পারে একমাত্র তোদের মত পরোপকারীরা। প্রেমের ক্ষেত্রে পরোপকারের মত মূর্খতা আর কিছু নেই।'

শেখর ঠাট্টা করে বলল, 'তাহলে তুই একটা বড় লোকের হাবা ছেলেকে বিয়ে করে অন্যদের কম্প্যানীয়ান হিসেবে গ্রহণ কর।'

'তাও পারব না। বাইরে থেকে আমায় দুর্নীতিগ্রস্ত মনে হলেও আমার একটা নীতি আছে। সেই নীতিতে বাধবে। হাবা ছেলেটা হয়তো অন্যভাবে সুখী হতে পারত। তার সুখ নষ্ট করবার অধিকার আমার নেই। ঠকাবার অধিকারও নেই। তাছাড়া 'বড়লোক' শুনলেই আমার ঘেন্না করে। খাচ্ছে-দাচ্ছে আর ফুলছে। আলসে নধর। এক কথায় কুৎসিত।' মুখ টিপে হেসে যোগ করল দীপা, 'বরং তার চেয়ে রাজনৈতিক কর্মীও ভাল।'

'তবে তাই একটা ধরে গিলে ফেল।'

'অবশ্য তারা অনেকে বেশি দিন ও জীবনে থাকলে একটু যান্ত্রিক হয়ে পড়ে।'

'তবে মুস্কিল।'

'অবশ্য সবাই যে অমন হয় তা নয়। যেমন তুই।'

'সর্বনাশ। আমি তো পূর্ণ নই! তুই আমায় খুঁটে খুঁটে খাবি সে দুঃসহ।'

'এক মণ তিরিশ সের এক গেরাশে গেলা মুস্কিল। বিষম খাব যে!'

'তা বলে তুই একটা কাণ, একটা চোখ আর একটা ঠ্যাং, ধর, খেয়ে ফেললি, তখন রাস্তায় বেরোব কি করে।'

'উঃ, থাম! বীভৎস।'

'তাহলে তুই বিকাশকে বিয়ে করে ফেল। ও খুব অনুগত হবে। বিয়ের পর—'

'একেবারে গৃহপালিত হবে। গরুর মত। সকালে থলে-হাতে বাজার, দুপুরে ডিব-হাতে অফিস, সন্ধ্যেয় গল্প-মুখে রক, রাতের গোড়ায় খাদ্য, মধ্যে স্ত্রী, অন্তে নিদ্রা, বড়বাবু, মাইনের ইনক্রিমেণ্ট, মাসে একটা সিনেমা, দিনান্তে দুটো চোঁয়া ঢেঁকুর, বদহজম, ছেলের অসুখ, গিন্নীর বায়না, মেয়ের বিয়ে। ধুঁকছে সর্বদা। ভয়ঙ্কর মাপা। বিরক্তিকর। জঘন্য। সাফোকেটিং।'

'তবে বিয়ে কর প্রসূনকে, ও খুব স্ত্রৈণ হবে।'

'গা ঘিন-ঘিন করে, স্ত্রৈণ শুনলে।'

'মিনতির কথা মনে আছে? ও একটা মজার কথা বলত। বলত—স্ত্রৈণ পুরুষ দু'চক্ষে দেখতে পারি না, তবে চুপি চুপি বলি, আমার স্বামীটি যেন একটু স্ত্রৈণ হয়।

'মিনতির কথাটা আংশিক সত্য—বেশির ভাগ মেয়েই একথাটা অত্যন্ত স্থূলভাবে বোঝে। জানি না, মিনতি কিভাবে বুঝেছে।

আমিও স্ত্রৈণ স্বামী চাই; কিন্তু দুর্বল পুরুষের যে রুগ্ন আসক্তি ভিক্ষা করে, কণামত্র পেয়ে ল্যাজ নাড়ে, তাকে আমি ঘৃণা করি। সবল পুরুষের প্রবল প্যাশনে নারীকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ভেঙ্গে-চুড়ে তার মধ্যে সম্পুর্ণ আত্মনিমজ্জনই আমার কাম্য স্ত্রৈণতা।'

'সম্পূর্ণতার মধ্যেই সবল পূর্ণ পুরুষ আত্মনিমজ্জনের কথা ভাববে। অপূর্ণতার মধ্যে নয়।'

'এই খোঁচাটা তুই আগেও একবার দিয়েছিস। তবে শোন, তোকে একটা গোগন কথা বলি। আমার সংস্পর্শে যত লোক এসেছে তারা কেউ আমার অপূর্ণতার কথা বলে নি। আমি পুরোটা দিই নি বলে ক্ষোভ থাকতে পারে, কিন্তু পুরোটা দেওয়ার ক্ষলতা নেই একথা কেউ মনে করেনি। বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য লোকের এই মনোভাব আমার একটা গোপন আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়েছে।'

'কিসের আত্মবিশ্বাস?'

'হাসিস নে যেন। তোকেই বলছি মাত্র। আর কাউকে বলিনি লজ্জায় নয়, অনেকেই বুঝতে পারবে না। আমি মনে করি আমি পূর্ণ নারী। সেই পূর্ণ পুরুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটলে সে আমায় চিনবে, সে আমায় ফেলে যেতে পারবে না।'

'তোর কথাটা মানতে চাইলেও মানার উপায় নেই। কারণ তাহলে আমাকে পূর্ণ পুরুষের কোঠা থেকে বাদ দিতে হয়।'

'তুই পূর্ণ পূরুষ নোস্। অতিরিক্ত সমাজ-চিন্তা তোর কতগুলো ব্যক্তিবোধকে ভোঁতা করে দিয়েছে। সমাজকে ফ্যালনা মনে করছি না, কিন্তু সমাজকে ষ্টিমরোলার বানাতে চাই না। দ্যাখ, তুই আর আমি, কত দিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমাদের। পাশাপাশি রয়েছি বারো তেরো বছর। ঘি আর আগুন। কিন্তু কেউ আমরা বিশেষ গলি নি, জ্বলি নি। কবে থেকে আমরা বন্ধু এবং আমরা চিরকালই বন্ধু থাকব জানি দুজনেই। আমরা প্রেম বলতে দুজনে দুটো আলাদা জিনিষ বুঝি।'

'আমার কথা ছাড়। তোর কথা বল।'

'হ্যাঁ, নিছক নারী হিসেবে আমি পূর্ণ, মনে হয় আমার। আমি নিজেকে নির্লজ্জের মত নিঃশেষে দিতে পারি—পারব দিতে সেই পুরুষকে। পুরুষ তাই চায়। একটু শক্ত ভাষায় বলতে হচ্ছে, মাফ করিস। নারীত্বের হ্লাদিনী শক্তির মর্মমূল উদ্‌ঘাটন করে সে আত্মনিমজ্জন করতে চায়। কিন্তু এ সে পারে না, যদি না নারী তাকে চালনা করে। এ চাবিকাঠি পুরুষের হাতে নেই, আছে নারীর হাতে। এবং এই চাবিবাঠি যে-নারীর কাছে যতটা পরিমানে আছে সে তত পূর্ণ নারী। সব মেয়েই সহজাত ভাবে এ গুণ কিছুটা পায়। কিন্তু পুরোটা নয়। সংস্কারে লজ্জায় আচারে আচরণে সে গুণ চাপা পড়ে যায়। আমার যায় নি। অধিকাংশ নারীই ফ্রিজিড নিছক সেক্সুয়াল্ অর্থে বলছি না। কথাটা। সে অর্থে তো বটেই তার থেকেও বড় অর্থে—সামগ্রীক জীবনের ক্ষেত্রে—কথাটা সত্য। পুরুষ কিন্তু এই নারীকে চায় না। যদি সাময়িক প্রথম দর্শনের মোহ ঘটেও থাকে, তবু একটু ওগ্রসর হলেই সে প্রতিহত হবে, অর্থাৎ ব্যর্থ, অপূর্ণ, অতৃপ্ত, সঙ্কুচিত হবে। তার পূর্ণতার সাধনা বিঘ্নিত হবে। সে তখন পূর্ণতার সন্ধান করবে। লোকে 'খারাপ' মেয়েদের নিন্দেয় মুখর, আবার 'খারাপ' মেয়ের কাছেই সেই ঘুরে ঘুরে আসে—সেই আদি কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত। আসলে পুরুষ সমাজ-সংস্কার বিধি নিষেধ গড়ে একদিকে নারীকে বাঁধছে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে, আর সে বঞ্চিত হচ্ছে। নারীর কাছ থেকে নারীত্বের পূর্ণ স্বাদ সে পাচ্ছে না, পাচ্ছে সম্পত্তি-রক্ষক সন্তানের জন্মদাত্রীকে, এই অভাবই তাকে নিয়ে যাচ্ছে ঐ 'খারাপ' মেয়ের কাছে।

'যাক, 'খারাপ' মেয়ের কাছে যাওয়ার একটা অজুহাত পাওয়া গেল।'

'ফাজলামি করিসনা। দিলি ফ্লো-টা নষ্ট করে।'

'না, বল। বেশ লাগছে।'

'ইয়ার্কী ?'

'না, ইয়ার্কী নয়। মত বিরোধ আছে। সে তো তুই-ই বললি। কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করছি। ইন্টারেস্টিং। ও কথাটায় আপত্তি থাকলে এমন কি থট্-প্রভোকিং-ও বলতে পারি'।

'তাহলে আর একটু থট্ প্রভোক করি।'

'কর। তোর পূর্ণতার ব্যাপারটা আর একটু ব্যাখ্যা কর।'

'প্রেমের ক্ষেত্রে নারীই মুখ্য পরিচালিকা। নারী না দিলে পুরুষ পায়না। এবং অধিকাংশ নারীই দিতে জানে না। একদিন জানত। আজ ভুলে গেছে, ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অজে সে দেওয়ার ইচ্ছাতেই সংকুচিত হয়, জোরের সঙ্গে ইচ্ছা করতেও সে ভুলে গেছে। আমি ভুলিনি। ছাখ মাতৃত্বকে কী গ্লোরিফাই না করেছে পুরুষরা। আচ্ছা, তুই পুরুষ, তুই মাতৃত্বের কী বুঝিস! আসলে সম্পত্তি-সংরক্ষণের মুলে নারীকে বেঁধে রাখবার ফন্দি ওটা। মাতৃত্ব বলে কোন বস্তু নেই তা বলছিনা। কিন্তু মাতৃত্ব নারীত্বের অংশ মাত্র। নারীত্বকে মাতৃত্ব দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। স্বামীর সংস্কার টাও কেমন আলাদা করে ঢুকিয়েছে ছাখ। স্বামী যে সেই পূর্ণ। আমি বলি উলটো—যে পূর্ণ সে স্বামী।'

'তোর মা হতে ইচ্ছা করে না ?'

'খুব করে ভীষণ করে।'

তবে ?'

'একটি পুরুষের কাছ থেকে আমার একটি ছেলে চেয়ে নিলে কেমন হয় ভাবছি। চমকে উঠিস না। সত্যি-সত্যি করি নি কোন কলঙ্ক আমায় বিঁধতে পারে না। কিন্তু ছেলেটা যদি এই ধকল সইতে না পারে! এই ভয়ে ওটা আর করলাম না। নিজের জীবন নিয়ে এক্স্‌পেরিমেণ্ট করবার অধিকার আমার আছে। অন্যেরটা নিয়ে নেই।'

'এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের মূল্য একটু বেশি পড়ছে না ?'

'পড়বেই তো। বড় এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট যে। তোদের মত মাপা মাপা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট তো নয়। গোটা জীবনটা স্টেক করেই এ পরীক্ষা। এবং জীবন হাতে আছে মাত্র একটা। অতএব পরীক্ষার ফল যাই-হোক, পরীক্ষাটা দামী তা বোধহয় তুইও মানবি।'

'খরচা করাটাই দামী পরীক্ষার লক্ষণ বুঝি ?'

'খরচা করতে পারে কে ? দামী মন। অন্তত সেই কৃতিত্বটা দে।'

'দিলাম। নেক্‌স্‌ট্‌ ?'

'তাড়া আছে নাকি ?'

'নেমন্তন্ন করতে হবে না আরো ?'

'বোস্‌। যাবি'খন। একটা কথা বলি রে, শেখর। তোর যখন বিয়ে হয়ে যাবে, তোর বৌ যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে না, তখন আমার বেশ কষ্ট হবে। অনেক কথা মনের মধ্যে জমে থাকে, তোকে বলে নিজেই বুঝতে চাই! অনেক অভিজ্ঞতা তোর দর্পণে ফেলে বিচার করি। তাতে বিচারটা দুটো বিপরীত প্রান্ত থেকে হয়।'

• 'তুই একটুও একা বোধ করিস না ?'

'ভয়ংকর। সময়-সময় অবশ্য। সর্বদা নয়। একা বোধ না করে আমার উপায় নেই। সেই নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যেও অনেক সময় আমার ঐ ক্ষণ-সহচরদের সঙ্গ নিতে হয়। অনেক সময় তাতেও এটা কাটে না। তখন কোন না কোন ধরনের মাদকতার আশ্রয় নিতে হয়। সেই উত্তেজনায় একটু ভুলে থাকি—দ্বিগুণ অবসাদের কাছে ফিরে আসি তার পরে। মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, আমার জীবনীশক্তি যেন ক্রমে যাচ্ছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় কিনা বলতে পারি না। ভেতরে ঘটছে। খারাপ লক্ষণ। লক্ষণ এতদূর খারাপ যে মাঝে মাঝে আমি ভাবি—জীবনের অর্থ কী, উদ্দেশ্য কী!

এবং সত্যিই কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাই না। যে উদ্দেশ্যের কথা আগে বললাম—পূর্ণ মানুষকে খোঁজা—সে চলছেই। কোন দিন তা কপালে জুটবে না এটা বুঝেও আমি থামতে পারব না। ছুটতে আমাকে হবেই। উদ্দেশ্যহীন ছোটা। না, না, তোর কোনো উপদেশ আমি শুনব না। তুইও একটা পূর্ণ কিছুর জন্য ছুটছিস, এবং পাস নি, পাবি কিনা তাতেও সন্দেহ পোষণ করিস, অথচ থামতে পারিস না। সুতরাং তুই আমার থেকে কিছু ভাল নেই। তাছাড়া তোর মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম, তুই একটা রাজনৈতিক বক্তৃতা ছাড়বি। ও আমি শুনব না। যন্ত্রের মুখের কথা শুনতে চাই না, জেনেরালাইজ্‌ড্‌ তত্ত্ব অথবা উপদেশ শুনলে আমার মাথায় খুন চড়ে যায়। নিজে ফীল্‌ করে যদি কিছু বলতে চাস তবে বলতে পারিস। বল্‌, চন্দনার কী খবর ?’

এ কোন্ ছায়াপথ ধরে আমি যাচ্ছি! আবছা। আকাশ। জ্যোৎস্না। মাঠ। চলছি! কতক্ষণ ধরে হাঁটছি। কত পথ পেরিয়ে এলাম! কোথায় যাচ্ছি ঠিক জানি না, কিন্তু এক পরম আনন্দের একটা কিছু যেন অপেক্ষা করে আছে আমার জন্যে। কী সেই 'কিছু', ধারণা নেই। রাস্তা অনেকখানি। কষ্ট কম নয়। কিন্তু কষ্ট আমার আনন্দে পরিণত হয়ে যাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে। সে কি পা ফেলা, না হালকা হাওয়ায় ভেসে চলা। আমি যেন হাওয়ার ঢেউ-এর ওপর দুলতে দুলতে চলেছি। এক একটা ঢেউ আমায় কত দূরে এগিয়ে দিচ্ছে! কী বিপুল আনন্দে আমি যাচ্ছি। এখানে তুমি আছো। সর্বত্র, এই আকাশে, জ্যোৎস্নায়, মাঠে। ঐ জ্যোৎস্নার হালকা আবছা হাতে আমাকে ঘিরে আছ তুমি, যেন তুমিই আমায় নিয়ে চলেছ।

কতদূর এসেছি জানি না। এক যায়গায় এসে হঠাৎ যেন আমার ঘুম ভাঙ্গল। এতক্ষণ খুব স্পষ্ট করে কিছু দেখছিলাম না। এইবার দেখলাম। সেই আলোর গাছ। শেখর। হালকা আলোর বৃত্ত। চিকণ কাণ্ড। চারা একটা গাছ। আলো। বই। শেখর, মুহূর্তে গাছটা দুভাগ হয়ে গেল। কাণ্ডটা হয়ে গেল একখানা চকচকে ছোরা, আর লতাপাতার মাথাটা একটা কালো ষণ্ডা বীভৎস মুখ। ছোরাটা অনুজ্জ্বল হয়ে গেল। লাল। বিন্দু ঝরছে। সেই মুখটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আতংকে জেগে উঠলাম। প্রচণ্ড কোলাহল।

স্টেশন এসেছে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আমার আলোর গাছ কোথায়! আমি যে সেই গাছের তলায় আমার মাথাটা একটু রাখতে চাই, শেখর।

এই মাত্র ডাক্তার এসে দেখে গেল টোপনকে। না, তেমন কিছু নয়। ওষুধ দিলেন। ভয়ের কিছু নেই। দিল্লী গেলেও খুব আপত্তি নেই। তবে যাওয়ার সময় রাস্তায় খুব সাবধানে নিতে বললেন। ভয় করছে। যদি এই জার্নির জন্য জ্বরটা বেড়ে যায়। তুমি যেই সকালে এসেছো, তখনই বুঝেছি একটা অঘটন ঘটাবে। অবশ্য আজ আমি আসতে বলেছিলুম। যাক্, যত অঘটনই ঘটাও, আমি যাব, আমাকে ঠেকাতে পারবে না।

টোপনকে শুইয়ে রেখেছি। এমনিতে দেখতে ভালই আছে। তবে একটু নির্জীব। আর কী যেন ভাবছে। হয়তো বাপের কথা। ও না শেষ পর্যন্ত ওর বাপের মত ভাবুক হয়ে ওঠে। ব্যাটাছেলের অত ভাবুক হওয়া ভাল নয়। ও-বিলাস ওদের পোষায় না। ওরা হবে কাজকর্মের লোক। প্র্যাকটিকাল, ডেয়ারিং, ড্যাশিং। ওদের ঘরের কোণে মিনমিনে কল্পনা নিয়ে বসে থাকা উচিৎ নয়। ভাবুক হওয়ার বিলাস মেয়েদের পোষায়। ওদের কাজ কম, সময় বেশি। আর নিজের মনটাকে ঘাঁটতে ওরা ভালবাসে—যেমন ভালবাসে ওরা শিশুকে ঘাঁটতে, চটকাতে। শিশু ওদের মনেরই একাংশ। মনেরই দৃশ্যমান অংশ, স্পর্শযোগ্য একটি রূপান্তর।

'মা, দিল্লীতে ঐ ঘোড়াটা নিয়ে যাব।'

'যেও।' ঐ রকিং হর্সটা টোপনের খুব প্রিয়। কত সময় যে ওটায় চড়ে ও দোলে! ওটা তোমার দেওয়া। ওটায় ওকে চড়ে দুলতে দেখলে নানা কাটা-কাটা-ছেঁড়া-ছেঁড়া ছবি আমার মনে আসে। ঐ ঘোড়াটা তোমার মতই। টোপনকে কাঁধে নিয়ে ছুটছে। ফ্রেমে বাঁধা। আমিই সেই ফ্রেম। বেঁধে রেখেছি। নইলে কবে তুমি ওকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে। এখন পারছ না,

কিন্তু একদিন পারবে। ফ্রেমটা ভেঙ্গে ঘোড়া আর তার সওয়ার অদৃশ্য হয়ে যাবে। ভাঙ্গা ফ্রেমটা ঢুলবে, কাঁপবে। শূন্য একটা ফ্রেম মাত্র। গোটাকতক কাঠের টুকরো। হাড়ের টুকরো কতগুলো —প্রাণহীন। আমি পড়ে থাকবো—শূন্যে।

॥ শেখর ॥

চন্দনার কথা কী বলবে শেখর! দীপা জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু সবটা শেখর নিজেই বোঝে না। অবশ্য দীপার 'লোভনীয় অংশ ও লোভনীয় মুহূর্তের' সমস্যা তাদের মধ্যে নেই। এত কম তাদের দেখা হয় যে সবটুকুই লোভনীয়। ভবিষ্যতে এ সমস্যা দেখা দেবে কি না সে বলতে পারে না। একটা কথা সে ভেবেছে, নিকট সান্নিধ্যে লোক পুরোনো হতে পারে, কিন্তু নতুন আবিষ্কারও কি একেবারে ঘটে না!

শেখরের কৌতুক-উজ্জ্বল অংশটা ঝিকিয়ে উঠল: 'নিজের মনকে চোখ ঠারছ না তো?'

উত্তর দিল তার আর এক অংশ: 'কি করে বলব, অভিজ্ঞতা নেই তো।'

'বাঃ! চন্দনার সঙ্গে অভিজ্ঞতা নেই হয়তো। কিন্তু রুমীর সঙ্গে? তাকে তো ভালবেসেই বিয়ে করেছিলে! দুদিনে তার মধ্যে কাম্য অংশ এক বিন্দুও অবশিষ্ট রইল না।'

'চন্দনার ক্ষেত্রে তা হবে না।'

'হবে না জানছ কি করে?'

'না, না, তা হবে না।'

'চীৎকার করো না! কেন হবে না?'

'ওকে আমার ভাল লাগে।'

'রুমীকেও ভাল লেগেছিল।'

'সে এ রকম নয়।'

'একে খারাপও একটু অন্য রকম ভাবে লাগতে পারে।'

'না, না। তুমি দূর হও। আমার মনে সংশয় জাগিও না।

আমাকে একটা যায়গায় একটু দাঁড়াতে দাও। আমার পায়ের তলায় মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। দোহাই।'

'আচ্ছা আপাতত যাচ্ছি। তোমাকে এখন বড় করুণ দেখাচ্ছে। তাই যাই। তবে আবার আমি আসব। আমায় দূর করবে কি করে তুমি। আমি যে তোমার মধ্যে আছি। আমি যে তুমিই। তোমার আর এক সত্তা।'

'আমি যখন সারা দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে একটা কোন সুর বাজিয়ে তোলবার চেষ্টায় আমার মাথার শিরা ছিঁড়ে ফেলি, তখন তুমিই তারগুলোকে জট পাকিয়ে সুরটা নষ্ট করে দাও, তাই না ?'

'হ্যাঁ, সে আমিই, ঠিক ধরেছ। কিন্তু আমাকে যে তুমিই তৈরী করে তুলেছ।'

'মিথ্যে কথা। আমি তুলিনি।'

'পরিপার্শ্ব গড়েছে তোমাকে। তুমি গড়েছ আমাকে। আমাকে তুমি ভয় পাচ্ছ, তাই না ?'

'পাচ্ছি।'

'কেন ?'

'আমি তোমাকে টুঁটি টিপে মারতে চাই। কিন্তু আমি তোমার হাতে অসহায় বন্দী। আমি শেকল ভাঙ্গবার চেষ্টা করছি, কিন্তু—'

'পারবে না ?'

'পারব! আমাকে পারতেই হবে। একজন কাউকে আমি পাশে চাই। তাহলে পারব।'

'দুটো অন্ধ লোক যোগ করলে একটা দৃষ্টিমান লোক হয় না।'

'তবু আমায় চেষ্টা করতে হবে। আমি হাল ছাড়তে পারব না। তুমি একটু দূরে সরে যাও। আমি চন্দনাকে ডাকি। চন্দনা, চন্দনা, আমার কাছে এসো। সূর্যোদয়ের মত এসো, আমায় আলো করে দাও। মন্ত্রের মত এসো, আমায় সজীব করে তোলো চন্দনা।'

'কী, এলো ?'

'না। পুরোটা নয়।'

'তাহলে ?'

'ভাল লাগছে না আমার।'

'আচ্ছা, আমি একটু গা-ঢাকা দিই ডেকে দেখো আবার।'

'চন্দনা, চন্দনা, চন্দনা—'

তোমাকে আমি পেয়েছি কম। আজকের কথা বাদ দিচ্ছি। সেই প্রথম দিনগুলোতেও তুমি ছিলে কাজের মোড়কে মোড়া। তোমার দরজায় কত দিন ব্যর্থ আঘাত করে আহত হয়ে ফিরে এসেছি! কেঁদেছি, রাগ করেছি, তোমার কাজকে অভিশাপ দিয়েছি। কিন্তু তোমায় ছেড়ে যাব এ কথা ভাবতে পারি নি। আমার চাকরিটুকু বাদ দিয়ে বাকী সময়টা একটা নিমন্ত্রণ পত্রের মত তোমরা সামনে পাতা থাকত। কিন্তু কাজের বেড়া ছড়ানো ছিল তোমার পথে।

আসলে তুমি তখন ভাঙছিলে। ভাঙতে শুরু তুমি করেছ অনেক দিন থেকে! ঐ সময় রাজনীতি জগতের বড় একটা চোট লেগেছিল। তোমার তরী ডোবার দাখিল। তুমি সেটা সামলাবার চেষ্টায় বিদীর্ণ। দেখা হলে মাঝে মাঝে তুমি এটা-ওটা বলেছ, কিন্তু তখন দীর্ঘ অদর্শনে মন এত ভারাতুর থাকত যে আমি ওসব তেমন বিশেষ কিছু শুনতাম না, বাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে বলে শুধু চটতাম। এর মধ্যে আমি তোমার সাহায্যে বি-এ, এম-এ, পড়ে ফেললাম, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শে এলাম কিছুদিন, এবং দুটো ব্যাপারেই মা-র অমত ছিল, কারণ আমার ভাইবোনদের অনশনে পড়তে হবে এই ছিল ওঁর আশংকা। সেই স্বল্পভাষিণী দু'বারই শুধু উচ্চারণ করেছিলেন একটি কথা, 'না'। আর দু'বারই আমি সেই 'না'-কে অমান্য করেছিলাম। মা যেখানে একবার অমানিত হয়েছেন, সেখানে আর তিনি সম্পর্ক রাখেন নি। এখানেও তার অন্যথা হলো না। আমার ভাইবোনকে না খাইয়ে রাখব না আমি—এ কথাটা বোঝাতে পারলাম না। মা এ ব্যাপারে কোন রিস্‌ক্ করতে রাজী ছিলেন না। শীতল একটা প্রাচীরের ব্যবধান ঘটে গেল। ঢাকা ছাড়বার

পর থেকে আমরা ছিলাম বন্ধু। আমাদের আমরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। মার ব্যবহারে বোঝা গেল তৃতীয় এক ব্যক্তি একটি ফাটলের মত আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে, এবং সে-ব্যক্তি তুমি। আমরা দুজনে দুজনকে হারালাম। আমার তুমি ছিলে। মা একা হয়ে গেলেন। হয়তো না, আমার অন্য ভাইবোনেরা ছিল। বাড়ি আমার কাছে শুধু বাসস্থল হয়ে গেল। অথচ তোমাকেও আমি পেতাম না। আমি কেমন এক ধরনের ফাঁকা হয়ে রইলাম। মাঝে মাঝে একটা বেদনা তীব্র হয়ে দেখা দিত, মনে হতো আমাকে তোমার প্রয়োজন নেই। এই ভুল ভাঙ্গতে অনেক দিন লেগেছিল।

যখন এই ভুলের বেদনায় বিপর্যস্ত থাকতাম, তখন মাঝে মাঝে আমার সুখেনদার কথা মনে পড়ত। সুখেনদাও দাদার বন্ধু। ঢাকায় থাকতে আমার কিশোর মনে সে এক বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। আবেগে-উত্তেজনায় লোকটা—না, ছেলেটা ছিল প্রবল। তার উত্তাপ ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে রাজনৈতিক বিতর্ক পর্যন্ত সর্বত্র অনুভব করা যেত। অত্যন্ত জীবন্ত ছেলে। আমরা যখন ঢাকা ছেড়ে আসি, তখন সে জেলে। সুখেনদার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। সে এখনও পূর্ববঙ্গে আছে—বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সরকারের চক্ষুশূল হয়েও, নিদারুণ অত্যাচার ও দুঃখ ভোগের পরেও। সে কৈশোরের চোখে দেখা এক আদর্শ পুরুষ হয়ে আজও আমার মধ্যে আছে। দিল্লীর পার্লামেণ্টে বিতর্কের সময় বহুবার এম-পি-ধুরন্ধরেরা প্রশ্ন তুলেছেন—পূর্ববঙ্গের লোকেরা এদিকে আসছে কেন, ওদিকে থেকে দাবী-দাওয়া করলেই পারে আন্দোলনের মাধ্যমে। তখন আমার তাদের কাছে গিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়েছে, কেন আমরা এসেছিলাম। আর সুখেনদার প্রসঙ্গ তুলে বলতে ইচ্ছে করেছে—এখনও ওখানে মানুষ আছে।

সুখেনদার কথা তোমায় বলেছি। তবু সবটুকু কি বলতে পেরেছি? আমার অনুভূতির রাজ্যে সে ঠিক কি ভাবে আছে

এ তুমি অনুভব করতে পারো না, পারাটা সম্ভব নয়। সেই জন্যে এক এক সময় মনে হয় যে তোমার সম্পর্কে কিছুটা অন্যায় আমি করছি। আমার মন ফোটার প্রথম সুরভি, স্বপ্ন ও উন্মাদনা আমি তোমায় দিই নি। তুমি হয়তো বলবে, 'তিরিশটা বছরের কোথায়ও কোনো একটু আঁচড় লাগবে না, এ কি হয়?' হয়তো হয় না। তবু আমার মনে হয়তো একটা সংস্কার, অথবা তার থেকে বড় একটা কিছু—কী তা জানি না—আছে।

সেই দিনটার কথা মনে আছে? তোমার ঘরে আর এক দিন। সেই বই, বিছানা, টেবিল, চেয়ার, আর চিকণ তন্বী দীপরক্ষিকা। আর ঘরের মালিক। আজ কঠোর নয়। বরং বিপরীত। তোমার কাছ থেকে এল চূড়ান্ত আহ্বান, যে আহ্বানের জন্য আমি দিনের পর দিন রাতের পর রাত জেগে ছিলাম। তুমি আমার হাত ধরলে। আমি শিউরে উঠলাম। কাঁপা আমার থামল না। চোখে জল এসে গেল। তোমার হাতের মধ্যে আমি মরে রইলাম। আমার আর সব চেতনা মৃত হয়ে তোমার স্পর্শের যায়গাটায় বেঁচে রইল। সেই বেঁচে থাকার একটা কম্পন ঐখান থেকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল—সারা দেহে, মনে, বিশ্বভুবনে। মনে হলো, আলোর গাছের তলায় আলো-আলো ছায়ার বৃত্তের মধ্যে এসে গেছি, মিশে গেছি ঐ ছায়া-ছায়া আলোর মধ্যে, তোমার মধ্যে।

তবু আমি পারলাম না। তোমার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য নেই আমার। আমি যে জানি কী প্রবল বেগে তুমি আসছ, সেই গতির সঙ্গে আমি মেলাব কি করে আমার শ্লথ শিথিল পদচারণাকে! আমি জানি, তুমি তোমার মধ্যে কি ভাবে ভেঙ্গেছো। তোমার নিজের ভাষায় তুমি 'এক ধ্বংসস্তূপ'। সেই স্তূপকে আবার গড়ে দেবার শক্তি আমার কোথায়, কোথায়! তোমার মন দ্বন্দ্ব-দীর্ণতার এক বিস্তীর্ণ ইতিহাস, তার পরিপূর্ণ সুষমা-সঙ্গতি এনে দিতে পারব এত আস্থা আমি কোথায় পাব? আমি যে

আমাকেও জানি। আমি নিজেও ভেঙ্গে-চুরে একশা। দ্বন্দ্বের মীমাংসার সংগ্রামে আমিও বিপর্যস্ত, ক্লান্ত। আমি ক্ষুদ্র। তোমাকে ধারণ করতে পারি এমন আধার আমি নই। মুহূর্তের আশ্রয় পাবার পর মুহূর্তে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে, আশাভঙ্গের আর একটা ইতিহাস রচনা করতে চাই না তোমার মধ্যে। আমার ক্ষুদ্রত্বকে যেদিন তুমি আবিষ্কার করবে সে দিনের দুঃখ থেকে তোমাকে আমি বাঁচাবো। এই আমার প্রেমের সাধনা।

তোমার কাছ থেকে ফিরে আমি কাঁদলাম। এক মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে পড়লাম। এ এক নিত্য দ্বন্দ্ব—নিজের সঙ্গে। আমার ক্ষুদ্রত্বের দায়িত্ব চাপালাম ঈশ্বরের ওপর, তাকে অভিশাপ দিলাম। আমার অক্ষমতা আমাকে লজ্জিত করল। আমার অপ্রস্তুতি আমাকে বিদ্ধ করল—বেদনায়, আত্মগ্লানিতে।

কিন্তু আমি তো মানুষ। অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। আমার কামনার হাত থেকে তো আমার মুক্তি নেই। আমার সেই লোভের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম করে আমি বিক্ষত। তাই একদিন পাটনার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলাম। কিন্তু সেখানেও দুঃসহ। তাই আমায় ছুটে ছুটে আসতে হয় তোমার কাছে—আবার ফিরে যাবার জন্যে। যেন অমৃত-বারি নিয়ে যাই আমি আমার তৃষ্ণার জন্য!

শেখর, আমার ক্ষুদ্রত্বের কথা তোমার কোনো দিন মনে হয় নি? সত্যি করে বল।

চন্দনার চিঠিটা পকেটে ছিল। ট্যাক্সিতে উঠে দেখল একবার চিঠিটা: '…আর আমি পারছি না। এই টানা-হেঁচড়া করে নিজেকে জীর্ণ করে ফেলছি আমি। তুমি একটা কিছু জোর করে করো না কেন? হয় আমাকে ছিঁড়ে নিয়ে যাও তোমার কাছে। নয়তো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দাও। এই জীবনব্যাপী অনিশ্চয়তার হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও। তুমি মুক্তি নাও বিড়ম্বনার বন্ধন থেকে। এ বন্ধনে শুধু বেড় আছে, আনন্দ নেই। ফুল-হীন মালা। ডোর সার। শেখর, জীবনকে নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করতে আর পারি না। তিরিশটা বছর জগৎ আমায় নিয়ে ভেঙ্গে-চূরে গুলে-ঢেলে নেড়ে-ফেলে মাড়িয়ে-গুঁড়িয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করেছে। আর আমি সেই পরীক্ষার উপাদান হয়ে থাকতে পারছি না। মানুষ হতে চাইছি, খাঁটি একটি নারী। শেখর, তুমি পার না আমায় সেই নারীতে পর্যবসিত করতে? শুধুমাত্র নারী। আর কিছু নয়। সেইরকমভাবে তুমি আমাকে নাও। আমার সীমাবদ্ধতা যদি একদিন তোমায় পিষে মারে,—সেই আতংকে আমি কিছু করতে পারি না। আমি মনে প্রবল, বাইরে অথর্ব। শেখর, আমি আসছি। আর সব চিন্তা এখন দূরে চলে যাক। আমার মন একটি স্রোতের মত শুধু তোমার দিকে যাক।'....

'বাবু।' ড্রাইভার ডাকল। শেখর এসে গেছে প্রবাল বোসের হোটেলের দরজায়। স্টেশনে ঠিকমত সময় পৌছতে হলে আর ট্যাক্সি ছাড়া উপায় নেই। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল শেখর। পরে আর একটা নেবে। কারণ প্রবাল একটু বকবক করবে নিঃসন্দেহে।

প্রবাল বিলেত-ফেরৎ বড় দরের ইঞ্জিনীয়ার। প্রচুর টাকা রোজগার করে। বিয়ে করেছিল, ডিভোর্স হয়ে গেছে। থাকে

একটি বিলিতি হোটেলে একটি কামরা নিয়ে। শেখরদের থেকে সামান্য বয়সে বড়। ইয়োয়োপের সাহিত্য পড়াশুনো আছে ভাল। সেই সূত্রেই শেখরের সঙ্গে বিশেষ জমে গেছে। নইলে উভয়ের অমিলই প্রাধান্য পেত।

আরে শেখর যে! এসো, এসো। অনেক দিন দেখা হয় না। দয়া করে এক আধ দিন এ বুর্জোয়ার ঘরে না-হয় পায়ের ধুলো দিলেই। বোসো, বেশ আরাম করে বোসো। পা তুলে, কাৎ হয়ে, চিৎ হয়ে—যা ইচ্ছে। ঐ ব্যাপারটায় এদেশে সাহেবী ধরন নেওয়া উচিৎ নয়, মনে করি। ভেবে ছাখো তো, তাকিয়া-ফরাসের মত জিনিষ হয়? তার পর কি খবর বল। কান্তি-সুবর্ণার 'পুনর্মিলন'! সে খবর তো জানি। কোথায় জানলাম! তোমাদের হরেনের সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল রাস্তায়। ও বলল। তা ওরা ব্যাপারটা মন্দ করেনি। ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগিয়ে দিলে! আমি চেষ্টা করব? হা হা, বেশ কথা বলেছ। আরে ও সব হচ্ছে কচি হাড়—চট করে জোড়া লাগে। আমাদের বুড়ো ঝুনো হাড়। তা তুমি তো আমার চেয়ে কিঞ্চিৎ কচি আছো। চেষ্টা করে দ্যাখো না! বলো তো, না হয় দূত হিসেবে রুমী দেবীর কাছে চলে যাই। খুব খারাপ গো-বিটুইন্ হবো না হে। না-হয় হাতুড়িই ঠুকি, তা বলে দুটো-একটা কায়দা করে কথাও বলতে পারব না? দরকার নেই? নাঃ, তুমি একটা হোপলেস্। আরে হ্যাঁ, আমার তো এদিকে 'পুনর্মিলন' হবার জোগাড় হয়েছিল। না, না, বিচলিত হবার কিছু নেই। জ্যোৎস্নার সঙ্গে একদিন দেখা। ওকে দেখলে আজকাল বড় কষ্ট হয়, জানলে শেখর। ওর যদি একটা বিয়ে হয়ে যেত আবার কারো সঙ্গে, ভাল হতো। ওকে এত পেল্ দেখাচ্ছিল যে, বিশ্বাস কর শেখর, আমার একটু কষ্টই হচ্ছিল। না, পুনর্মিলন অবধি গড়ায় নি, বাক্যালাপেই পরিসমাপ্তি। আমি ওকে বার কয়েক টাকা সাহায্য করতে চেয়েছি। না, ঔদ্ধত্যে নয়, বিনয়েই। ও নেয় নি। জ্যোৎস্নার সঙ্গে দেখা হবার পরেই শুনলাম কান্তি-সুবর্ণার কথা। বেশ আনন্দ হলো। ওরা যা হোক একটা গড়বার চেষ্টা করছে।

আমরা তো কেবল ভাঙ্গতেই আছি। তুমিও। এ ক্ষেত্রে অন্তত আমরা সগোত্র। শেখর, তোমার ডাইভোর্সের কারণটা কী, তা কোনো দিন ভেবে দেখেছো? সব দায় নিশ্চয়ই রুমীর ওপর চাপিয়েছো? আমিও তাই। কিন্তু এখন এক এক সময় অন্য কথা ভাবি। না, নিজের দোষ বলছি না। আসলে বিয়ের পর প্রথম বুঝলাম যে আমি কত নিঃসঙ্গ। কথাটা প্রথমে শুনতে উদ্ভট, কিন্তু তুমি হয়তো বুঝবে। বিয়ের আগের একাকীত্বের তবু সান্ত্বনা আছে, আশা করবার ক্ষেত্র আছে, কল্পনায় অন্তত সে একটা সঙ্গী পায়। বিয়ের পর সেইটা ভাঙ্গে, অন্তত ভেঙ্গেছে আমার ক্ষেত্রে। তখন এক বিশ্রী রকমের যন্ত্রণা। খাঁচায় বাঁধা একাকীত্বের চেয়ে আকাশে ছাড়া একাকীত্ব অনেক ভাল। কী বলছ? ইয়োরোপের কথা? সে তো তুমিও বই পড়ে জানো। আমি দু'চারবার গিয়েছি অবশ্য, কিন্তু আমরা তো ওদের দেখি অনেক বাইরে থেকে। হ্যাঁ, তোমাদের রাশিয়াতে নাকি ডিভোর্সের সংখ্যা বেড়েছে। এমন কি, এ কথাও খুব চালু যে তৃতীয় বিয়েই পাকা বিয়ে। শক্‌ড্‌ হচ্ছো নাকি? হচ্ছো না? কেন? ফ্রি চয়েসের সুযোগ থাকলে ডিভোর্স কিছুটা হতেই পারে—হ্যাঁ, তা ঠিক। আসলে আমার সমস্যা তা নয়। আমি ভাবছি, ওরা ডিভোর্স সত্ত্বেও সম্পর্কটা গড়তে পারছে কি না! পশ্চিমের এবং আমাদের কেউ কেউ বিয়ে করেও সম্পর্ক গড়তে পারি না, একা থেকে যাই, ওরা সেটাকে কাটাতে পেরেছে কি না, এটা তোমাদের সমাজতন্ত্রের সামনে একটা বড় প্রশ্ন নয়? ফ্রান্সে তো নাকি একটা দল বিয়ের চেয়ে স্বাধীন 'লিভ-টুগেদার' বেশি পছন্দ করে। না, খারাপ লোকদের কথা বলছি না। সার্ত্র তো তোমাদের মতে খারাপ লোক নয়। সার্ত্রের কথা ভেবে ছাখো। কনজারভেটিভের দেশ ইংলণ্ডেও বার্টাণ্ড রাসেল তো বিয়ের আগে যুবক-যুবতীদের বেশ কিছুকালের জন্য সর্ব অর্থে 'শিক্ষানবীশ' থাকতে বলেন, সেই ট্রায়াল-বিয়ের পরে আসল বিয়ে।

যাক গে, এ সব কথা থাক। তোমার খবর বল। একটু পানীয় চলুক। নয় কেন? তাড়া আছে? ধুৎ তেরি, ঘোড়ায় জিন পরিয়ে কেন আসো? পরে একদিন এসো—হ্যাঁ, ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে কিন্তু।

॥ শেখর ॥

ট্যাক্সি। চন্দনার চিঠি: '—শেখর, আমার সীমাবদ্ধতা যদি একদিন তোমার কাছে ফাঁস হয়ে দেখা দেয়, তবে কি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? আর আমি ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে যাবই বা কেন! যেমন নিছক নিরাপত্তার কাঙ্গাল হয়ে বিয়ে করতে ঘেন্না করে, এও তার কাছাকাছি। তুমি হয়তো দিতে পারো ক্ষমা, নিরাপত্তা। কিন্তু তুমিও তো কিছু চাও। খুব বড় একটা সম্পর্ককে তুমি পেতে চাইছ। সেখানে আমি কতটুকু! শেখর, তুমি জানো না, আমিও একটা ছোট ভগ্নস্তূপ। এক এক সময় স্তূপের টুকরোগুলো তোমাকে ধরে গোটা একটা হয়ে দাঁড়াতে চায়। তখন আমি হঠাৎ খুব বড় হয়ে যাই—তোমার বাঞ্ছিত আকাশের মত। টুকরোর থেকে গোটা এক তো বড়ই। কিন্তু এই শক্তি আমার সব সময় থাকে না। তুমি পারো না আমার মধ্যে সব সময় সেই শক্তির সঞ্চার করে রাখতে?'

নিমন্ত্রণের শেষ বাড়ি। পরেশ ও বুবু। শান্ত, স্থির। আদর্শ দম্পতি—লোকে বলে। দাম্পত্যের সব বিধি নিত্য পালিত—অক্লেশে। ওরা কোনো দিন ঝগড়া করেছে কিনা কে জানে! কান্তি-সুবর্ণার সংবাদে ওরা খুশী হলো, আশ্চর্য হলো। শেখরের মনে হলো, খুব ভেতরে ওরা ওসব কিছুই হয় নি হয়তো, সৌজন্য মাত্র ওটা।

সংযম ও সৌজন্য ওদের কী রকম প্রাণহীনভাবে সুখী করেছে। শেখর বেশ কল্পনা করতে পারে, ওরা রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে প্রাত্যহিক পারস্পরিক নিয়মিত সমাদর করে—যেমন ওরা বাজার করে, রান্না করে, আফিসে যায়, ট্রামে ঝোলে, তেমনি। যথোপযুক্ত সাড়া দেয় পরস্পরে। যথা সময়ে ওরা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে—কাল অফিস আছে যে!

শেখরের আর এক মন বলল, 'ওরা যদি ঐতেই সন্তুষ্ট হয়, তোমার কী?'

'ওরা সন্তুষ্ট নয় বলে আমার বিশ্বাস।'

'তোমার বিশ্বাসই যে সত্য তার প্রমাণ কি? খারাপ জিনিষ দেখে দেখে চোখই ঐ রকম হয়ে গেছে।'

'হয়তো তা হতে পারে। ওরা হয়তো সুখীই। আমিই শুধু ভাবছি। তবে য়ুং-এর কথা মনে আছে? য়ুং বলেছেন, দাম্পত্য-জীবনে একটু টেন্‌সন থাকা ভাল।'

আবার ট্যাক্‌সি। হাওড়ার দিকে। দ্রুত। 'আমি আসছি' —চন্দনা। 'আমি চলে যাচ্ছি।'—টোপন। যাওয়া আর আসা—দর্শনের সোনার কাঠি রুপোর কাঠি।

কান্তি আর সুবর্ণার ঘটনায় সবাই খুশী হয়েছে। ওদের কাছে ঘটনাটা ইণ্টারেস্টিং। কিন্তু শেখরের প্রশ্নের উত্তরে সুবর্ণা যা বলেছিল তা খুব আশাব্যঞ্জক কিনা সন্দেহ। একটা বাসী শুকনো মেয়ে নির্জীব গলায় বলেছিল, 'আর আমি পারছিলুম না, শেখরদা। ঘরে-বাইরে লোকের কাছে এত হীন হয়ে থাকতে হয় যে ও যখন এসে বলল—।'

বরং কান্তির কথাটা ভাল লেগেছিল শেখরের: 'জানিস্ শেখর, অনেক দিন ভেবেছি, এত সহজে হার মানা উচিৎ নয়। এ হারের পেছনে আমাদের দুর্বলতা রয়েছে, শৈথিল্য রয়েছে। সবগুলো সুযোগ আমরা পরখ করে দেখি নি। দুটো

একটা দেখেছি। তারপরেই 'ও হবে না' বলে হাল ছেড়ে দিয়েছি—ছোট ছেলেরা অংক কষতে গেলে অনেক সময় যেমন করে। আর একটু চেষ্টা করা দরকার, সাধনা দরকার। কোনো কিছুই সহজ নয়—প্রেমও নয়। অন্তত এ যুগে নয়।'

কান্তি পারল। অন্তত পারতে চাইছে। শেখর পারছে না কেন? না, রুমীর সঙ্গে নয়। চন্দনা। পারা উচিৎ।

স্টেশন। এত তাড়াতাড়ি এসে কোন লাভ হলো না। গাড়ি লেট। 'পনেরো মিনিটের মধ্যে তের নম্বর প্লাটফর্মে—' তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠে মাইক-ঘোষণা। শেখর একটা কাগজ কিনল। অর্ধেকটা পেতে বসে বাকীটা পড়তে লাগল। বার্টাণ্ড রাসেলের পরমাণু-বিস্ফোরণের প্রতিবাদ—সংবাদ। কিউবা। সার্ত্রের কথা মনে পড়ল। এখানে সাহিত্যিকরা কী রকম স্তিমিত। বাড়ি-গাড়িই মোক্ষ। ওদের দেশে বিবেক বস্তুটা বোধ হয় প্রবল।

ট্রেন ইন করল। চন্দনা নামল। একটি মেয়েকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল। ক্লান্ত চন্দনা। শেখরের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'কতক্ষণ এসেছ?'

'বেশ খানিকটা। গাড়ি লেট্।'

স্টেশনের কফি-কর্ণারে বসে চন্দনা ক্লান্ত হেসে বলল, 'হ্যাঁ, লেট করতে করতেই চলেছি।'

'যাক, তবু তো এলে।'

'এলাম কিনা কে জানে! ঠাওর করতে পারছি না।'

'সেই চিরন্তন!' মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেল শেখরের।

'তোমার কি মেজাজটা একটু খারাপ?'

'টোপনকে নিয়ে রুমী আজ চলে যাচ্ছে দিল্লী।' সবটা বলল শেখর। 'সেইজন্যেই কফি-কর্ণারে বসলাম একটু।'

'কত দেরী আছে ওদের গাড়ির?'

'আধ ঘণ্টা।'

'তাহলে যাও।'

'লাভ নেই।' করুণভাবে হাসল শেখর। 'রুমী আসবে ঠিক পাঁচ মিনিট আগে। টোপনের সঙ্গে আমার দেখাটা যাতে কম হয়।' একটু ভেবে বলল, 'তবু যাই, যদি আসে।'

'আমি যাব? টোপনকে একটু দেখব।'

'এসো।'

'না, থাক। রুমী আছে। তুমি যাও।

শেখর প্লাটফর্মে এসে দেখল, যা ভেবেছে তাই। রুমী তখনও আসে নি। এলো সে পাঁচ-সাত মিনিট আগে। টোপনের জ্বর হয়েছে। বিষণ্ণ অসুস্থ মাস্টার পল্। ওর জন্যেও অন্তত রুমীর থেকে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু রুমীকে সে কথা বলে লাভ নেই। ট্রেনটা তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার করে টোপনকে শেখরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।

॥ রুমী ॥

আমার কোলে টোপনের মাথাটা রেখে বসে আছি বাইরের দিকে চেয়ে। কোলকাতা থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। জানলা দিয়ে দেখছি, আমার তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তেমন আনন্দ হচ্ছে না, যেমন ভেবেছিলাম। বরং আমার ভয় করছে। টোপনের মুখের দিকে তাকালে সে ভয় বাড়ছে। কোথায় যাচ্ছি আমি। দিল্লী! চাকরী! অনির্দিষ্ট মনে হচ্ছে এ যাত্রা। একজনকে বঞ্চিত করছি ঠিকই, কিন্তু আমি কতটা পাব কে জানে। সবই অনিশ্চিত। এই যাত্রাটাও। অথচ আমি একটা নিশ্চিত কোথাও দাঁড়াতে

চাইছি। ট্রেনটা ছুটে চলেছে অনিশ্চিতের দিকে। টোপনের জ্বর বাড়ছে! ও ঘুমিয়ে পড়ল। আমার ভয় বাড়ছে। ট্রেনটা চীৎকার করতে করতে ছুটে চলেছে। যেন ওকে একটা ভয়ংকর কিছু তাড়া করেছে। আমার কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু একটা কোনো লোক না থাকলে কার কাছে কাঁদব! শূন্যতার কাছে কাঁদাও যায় না। কিসে যেন বুক চেপে ধরে। টোপন, তুই কবে বড় হবি?

॥ শেখর ॥

ট্রেনের পুচ্ছ ঐ এখনও দেখা যায়। টোপনকে নিয়ে চলে গেল। ট্রেন। রুমী। কবে টোপনের সঙ্গে আবার দেখা হবে! কবে সে দিল্লী যাবে! পেছন থেকে এসে হাতটা ধরল যেন কে। ও, চন্দনা!

'চন্দনা, টোপন চলে গেল।'

'আমি এসেছি।'

'তুমি তো থাকতে আসনি, চন্দনা।'

না, না, না। আমি থাকতেই চাই তোমার কাছে। শেখর আমায় তুমি বেঁধে রাখো, জোর করে রাখো। যেতে দিয়ো না আমায়। বলতে চেয়েছিলাম কথাগুলো। পারলাম না। সেই আমার চূর্ণ অন্তর, আমার সীমাবদ্ধতা, সেই আমার আত্মদ্বন্দ্ব—তারা সবাই আমার গলা টিপে ধরল। কথাগুলোই যেন দানা বেঁধে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। তোমার কাছে যাই আমার সে শক্তি নেই, শেখর। আমার ভয় করে। সেই অনির্দিষ্ট আতংকের ভাবী বিচ্ছেদ-দিন আমার আজকের দিনের আনন্দ নষ্ট করে। এই বর্তমানের মুহূর্তটাকেও কেন জোর করে আঁকড়ে ধরতে পারি না। মুহূর্তের পাত্রটুকু কেন কানায় কানায় ভরে নিতে পারি না? সংস্কার! আজও ছেঁড়ার সময় হয় নি সে-মিথ্যার। আজ ছিঁড়ে ফেলি সে মিথ্যা। তোমার বাহুর পেষণে। শেখর, আমাকে নাও। একান্ত তোমার করে নাও। তোমার মধ্যে আমায় ডুবিয়ে দাও। মুহূর্তের জন্যে হলেও তোমার সেই বিক্ষুব্ধ চঞ্চল সমুদ্রে আমি ডুবে যাই। হাওয়ার ঝাপটায় অস্থির আবরণীটাই আমার ওপর দিয়ে তুমি টেনে দাও। জগতের সব আলো নিভে যাক। শুধু একটা আবছা হালকা ছায়া-ছায়া আলো আমার সারা দেহ চুম্বন করে যাক—যতক্ষণ না আমি আলোর গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়ি।

॥ শেখর ॥

কয়েক মাস পরে। ট্রেন। দিল্লী যাচ্ছে শেখর। টোপনের বাড়াবাড়ি রকমের অসুখের সংবাদ এসেছে।

দিল্লী। রুমীর বাড়ি। টোপন শুয়ে আছে। মাথার কাছে মুখ গুঁজরে রুমী কাঁদছিল। তাকে দেখে ডুকরে উঠল সে। কোন এক ভাগ্যের সন্ধান করতে বেরিয়ে গেছে নতুন এক বিষণ্ণ অসুস্থ পল। 'মালাবার, মালাবার।' ঘোড়াটা ছুটছে। প্রাণপণে। তাকে জিততেই হবে। জিতেছিল মালাবার। সওয়ার ছিটকে গেল। জিতেছিল রুমী। ছিটকে গেছে টোপন। কান্নায় মুখটা তার এখন দেখাচ্ছে ঘোড়ার মতই। না, শেখর তার দিকে তাকাবে না। শোকটাকে সামলাবার জন্যেই যেন সে একটা কঠিন ঘৃণাকে জাগিয়ে তুলল তার মধ্যে। রুমীর দিক থেকে সরিয়ে নিল সে মুখটা।

॥ রুমী ॥

মুখটা সরিয়ে নিও না। আমার আর কেউ নেই। টোপনকে আমি মারি নি। আমি শুধু চাই নি তোমাকে দিতে। তুমি আজ আমার কেউ নও। তবু তুমি তো একদিন আমার স্বামী ছিলে। টোপনকে পেয়েছিলাম তো তোমার কাছ থেকেই। একটু দাঁড়াও। টোপনের জীবন্ত স্পর্শ তোমার মধ্যে এখনও বেঁচে আছে। তোমার স্পর্শের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দাও আমাকে একটু। এ দাবী আজ আমি করতে পারি না জানি। তবু এটুকু আমাকে ভিক্ষে দাও। আমি ভিক্ষে চাইছি তোমার কাছে।

কোলকাতা। দিল্লীতে টোপনকে ভস্মে নিঃশেষ করে ফিরল। এসে দেখে—চন্দনা। পাটনা থেকে সেই দিনই এসেছে। উদ্‌ভ্রান্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, রাত-জাগা চেহারা! শেখর জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

যা অনেক দিনই হতে পারত, তাই হয়েছে। উভয়ের প্রেম চন্দনার দেহের আধারে নতুন আকার নিচ্ছে। চন্দনার চোখের কোলে কালি। দেহ শীর্ণ। তার হাতটা ধরল শেখর। হাতটা কাঁপছে।

'তোমার কী হয়েছে—এমন চেহারা?' জিজ্ঞেস করল চন্দনা।

'টোপন নেই!'

শেখরের চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে এগিয়ে এল চন্দনা, মিশে গেল শেখরের সঙ্গে।

অনেকক্ষণ পরে শেখর বলল, 'আমরা বিয়ে করব।'

'তা হয় না, শেখর।'—অস্থির চন্দনা।

'কেন? কেন হয় না চন্দনা?'

'হয় না, হয় না।'

'কেন, কেন?'

কেন ! নিজেকে আমার আরো হীন মনে হবে, শেখর। এ যে হঠাৎ দায়ে পড়ে তোমাকে বিয়ে করা হবে। এতদিন যে কারণগুলো বাধা হিসেবে ছিল, তা তো আছে। নিজের বিপদ ঘটেছে বলে বাধাগুলো সরে তো যায় নি। তুমি বলতে পারো, 'দায়িত্ব তো আমারও।' হ্যাঁ, তাহলেও আমার বাধাগুলো ঠিক এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে, তাই না ? তাহলে বিয়ে না করে একে জগতে এনে লালন করব ? খুব ইচ্ছে করে তা, কিন্তু আমি ভীরু, সংস্কারবদ্ধ। আগেই তো বলেছি আমি তোমাকে আমার ক্ষুদ্রত্বের কথা। 'ঢাকার মেয়ে' গুঁড়ো হয়ে গেছে, শেখর। আরো আগে হলে হয়তো পারতাম। এখন ? এখনও হয়তো পারি। খুব চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করতে বলছ ? তারপর ? আমি হয়তো সহ্য করলাম কলংকের কাঁটা। কিন্তু সেই নির্দোষ ছেলেটা—তাকেও তো একদিন জগতে পরিচিত হতে হবে। তখন তার দুরবস্থাটা ভাবলে আমাকে দায়ী মনে হয়। না, তাকে এই বিড়ম্বনা-যন্ত্রণা-লজ্জার মধ্যে আমি আনতে পারব না। তবে ? ওর জগতে আসা বন্ধ করব ? সেও তো অন্যায়। সেও একটা হত্যা। না, আমি পাগল হয়ে যাব। শেখর, আমাকে বাঁচাও।

তুমি বললে, 'না, হত্যা চলবে না।'

চন্দনার হাতের ওপর হাতটা রাখল শেখর। হাতটা বলল, 'না, হত্যা চলবে না।' হাতটার মধ্যে তখনও একটা সদ্য মৃত্যুর স্পর্শ ছিল। আর মৃত্যু নয়।

এই হাত দুটো কতবার পরস্পরকে ধরেছে। উত্তাপে, সজীবতায় আনন্দে। কোন দিনই মৃত্যুর ছায়া ছিল না সেখানে।

আর এ মৃত্যু তো অপর কারো মৃত্যু নয়। নিজেদেরই আংশিক মৃত্যু, পরোক্ষ মৃত্যু।

দুটো সজীব হাতের মধ্যে আর একটা প্রাণের স্পন্দনকে খুঁজতে লাগল শেখর।

'দিল্লী গিয়েছিলে কেন?' জিজ্ঞেস করল চন্দনা।

'রুমীর কাছে।'

'রুমী! কী, ব্যাপার!'

'টোপন—'

টোপন—!

তোমার হাত থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে যখন বাসে গিয়ে উঠলাম, তখন বাসের চাকার শব্দে শুধু শুনছি—টোপন, টোপন।

এর পর আর একটা মৃত্যুর কথা তোমাকে কী করে বলি! তাহলে বিয়ে! এই চাপে পড়ে! তাতেও যে পুরো সায় দেয় না মন। কী করি আমি! শেখর!

সহরতলীর বাস্। উদ্বাস্তু-কলোনীর ডেরায় যাচ্ছি—মা-র ওখানে। কাল বিকেলে ফিরে তোমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাব। তখন তোমার হাতে একটু হাত রাখতে পারব। একদিনের জন্য এখন আমার নির্বাসন। আজ এই নির্বাসনটুকুও আমার সহ্য হচ্ছে না।

বাস্-টা যত এগোচ্ছে, তত আমার অস্বস্তি বাড়ছে। আজকাল আমার বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কটা অদ্ভুত। খুব আলগা—প্রায় নেই বললেই চলে। ওদের আলাদা জগৎ, আমার আলাদা জগৎ। যদিও ওরা আমারই মা ভাই বোন। ভাইবোনদের আমি ভাল করে চিনিই না। ওদের চিন্তা-ভাবনা আমার কাছে অপরিচিত। ওরা এই কলোনীর সন্তান—তার দোষ-গুণ ওদের বর্তেছে। আমি তার বাইরে। তাছাড়া, আমি পরিবারেরই কেমন যেন বাইরে এখন। মা একদিন বন্ধুর মত কত কাছে ছিল! আজ আর তা নেই। এদের সঙ্গে আর আমি মেলাতে পারি না। এক-আধ সময় তার জন্য নিজেকে অপরাধীও মনে হয়। আমার বাড়ীকেই আমি অস্বীকার করছি! তবে আমি দাঁড়াব কোথায়? আমি যে ওদের থেকেও বড় উদ্বাস্তু হয়ে গেলাম। জানি, একটা জায়গা আছে—তোমার কাছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াবারও তো ভরসা

পাই না। কিন্তু এখন—! আমার মধ্যে জীবনের যে নতুন সঞ্চয়, আর তোমার জীবনে সন্থ যে বৃহত্তম অপচয়,—এ সবই আমাকে ঠেলছে সেই একটি দিকে, যেখানে আমি যেতে চাই একেবারে নিজের পায়ে, ঐ সঞ্চয়-অপচয়ের ক্রাচে ভর দিয়ে নয়।

সহরতলীর এই রাস্তাগুলোও আমার ভাল লাগে না। খোয়া-ওঠা, ধূলো-ওড়া, অমার্জিত, আর এই রাতের বেলায় কম পাওয়ারের আলোয় ময়লা-ময়লা লাগে চারধারের সব কিছু।

'দিদিমণি এস্চে রে।' পেছনের দোকানে নিম্নকণ্ঠের মন্তব্য শুনি।

এখানে রাস্তার আলোগুলো এত ঘোলাটে লাগে!

'দিদিমণিকে এত সুকনো সুকনো দেকাচ্চে কেন র‍্যা?'

মন্তব্যের যায়গাটা অতিক্রম করি। শুকনো দেখাচ্ছে! সারা দিনের ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তায়? অথবা সন্তান-সম্ভাবনার নানা চিহ্ন তার দেহে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। মা-র কাছে গিয়ে সে দাঁড়াবে কী করে! তার ভাই-বোনেদের নৈতিক বোধের অভাব সম্পর্কে যে সে নিজেই কত দিন বক্তৃতা করেছে মা-র কাছে। মা ঘটনাটা জেনে কী করবে! কিছু বলবে না। হয়তো ঘৃণায় মুখটা সরিয়ে নেবে। মাকে সে কিছুই বোঝাতে পারবে না।

'কে?' মা-র গলা।

আমি চমকে উঠলাম। মা যে বাড়ীর সামনে অন্ধকারে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল বুঝতেই পারি নি।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে—দাঁড়িয়ে—এই রাতে!'

'শুভ এখনও ফেরে নি।'

'এসে যাবে এখুনি। চল, ভেতরে চল।'

'না। ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। কিছু ছেলে খবর এনেছে।'

কাউকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে শুনলে তোমার কথা আমার

মনে পড়ে, শেখর। কোলকাতায় এসে প্রথম যেদিন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করলাম, তার অল্প পরেই তোমাকে পুলিশে ধরেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, একটু ভয় হয়, তোমার ওপর অত্যাচার হবে অথবা দীর্ঘকাল আটক থাকবে ভেবে আশঙ্কা হয়, কিন্তু তার পাশাপাশি আর একটা স্রোত আমার মনকে প্লাবিত করে। গর্বে, গৌরবে, মহৎ আত্মত্যাগের বেদনায় ও বিপুল এক ক্ষতি স্বীকারের আনন্দে আমি কাঁদি। কিন্তু এ তো সেভাবে যাওয়া নয়। আমি এখনও মাকে কিছু জিজ্ঞেস করি নি। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে কোন হীন কাজের মধ্যে শুভ ছিল। এত নিশ্চিত যে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। জিজ্ঞেস করলেই অনেক ক্লেদ আমাকে জড়িয়ে ধরবে। সেই মুহূর্তটাকে আমি পিছিয়ে দিতে লাগলাম।

এক সময় জিজ্ঞেস করতেই হলো, 'কী ব্যাপার? ছেলেরা কী বলল?'

'ও নাকি রেলের ওয়াগন ভেঙ্গে জিনিস চুরি করেছে। আমার বিশ্বাস হয় না। আমি বিশ্বাস করি না।'

ছেলের প্রতি মা-র বিশ্বাস বোধহয় অন্ধই হয়। আমিও মা-র মত বলতে পারলে বেঁচে যেতাম। কিন্তু আমি যে তা বলতে পারি না।

'তুই একবার যাবি?' মা-র উদ্বিগ্ন স্বর।

'কোথায়?'

'একটা কিছু তো করতে হবে।' মা-র উষ্মা উদ্বেগের ওপরে উঠে এলো।

'হ্যাঁ, করতে হবে।'

কত কিছুই যে করতে হবে আমাকে! এবং আরো কত দিন! কে জানে!

'ভাইবোনদের ওপর তোর আর কোন দরদ নেই, না রে?' শুধু উষ্মা নয় আর এবার, স্পষ্ট অভিযোগ। এমন জ্বালাভরা গলা মা-র

কাছে বড় একটা শুনি নি আমি, মা কারো ওপর রাগলে নীরবে তাকে অস্বীকার করে—খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে। অভিযোগ করে না। অর্থাৎ সব সময়ই নীরবে অভিযোগটা উক্ত থাকে। পুত্রের জন্য উৎকণ্ঠায় মা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ফেলছে।

'কিছু একটা করতে তো হবেই মা, আগে শুনে নি।'

'আর শোনার কী আছে, তাকে হয়তো এতক্ষণে পুলিশরা ধরে—'

মা কাঁদছিল কিনা অন্ধকারে আমি বুঝতে পারলাম না।

'আচ্ছা, দেখছি। বন্দনাকে ডাকো। ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরোই।'

'বন্দনা বেরিয়ে গেছে।'

'কোথায় ?'

'কতগুলো ছেলে এসেছিল শুভ-র খবর দিতে। তাদেরই সঙ্গে বেরিয়ে গেল।'

'কোথায় গেল ?'

'তা তো বলল না কিছু। বলল তো শুভকে ছাড়াতে যাচ্ছে।'

'কোথায় গেল কিছু বলে গেল না ?'

'না।'

'তুমি জিজ্ঞেস্ করলে না ?'

'তখন আমার মাথার কিছু ঠিক ছিল না।'

'ছেলেরা কারা ?'

'ঐ শুভ-র সঙ্গে আসে-টাসে।'

'বন্দনা গিয়ে কী করবে ? একটা সতেরো বছরের মেয়ে! ওকে ছাড়লে কেন ?'

'তবে কাকে ছাড়ব ? কে থাকে বাড়ীতে ?'

কথাটার লক্ষ্য আমি। বুঝলাম। বললাম, 'আমি হয়তো থাকি না। কিন্তু অত ছোট একটা মেয়ে এই রাতে—তাছাড়া

শুনে মনে হচ্ছে ও নন্তে হাবলু ওদের সঙ্গে বেরিয়েছে—ওদের পছন্দ করি না তুমি জান।'

'তোমার পছন্দ অপছন্দ আমি শুনে কী করব!'

সত্যি তাই। এবং হয়তো অপরাধীও আমি। হয়তো এদের মধ্যে থেকে প্রতি মুহূর্তে এদের আগলে রক্ষা করবার চেষ্টায় আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দেওয়া উচিৎ ছিল। তাও কি আমি সব ঠিকঠাক রাখতে পারতাম? জানি, পারতাম না। সে চেষ্টা এক সময় করি নি এমনও নয়। যদি সেই চেষ্টা সারা জীবন ধরে এখানে করে যেতাম, তার ফল যাই হোক, অন্তত মা-র অভিযোগ করার কিছু থাকত না, আমার নিজেকে অপরাধী মনে হতো না। সে এক হিসেবে ভাল হতো হয়তো। কিন্তু শেখর, আমি যে একটা সমস্যাকে প্রথমে সমাধান করে নিতে চেয়েছি। সেদিকে কী এত জোর পড়ল যে এদের—আমার মা-ভাই-বোনেদের—আমি অবহেলা করলাম! অন্নবস্ত্রে কষ্ট আমি দিই নি। নিয়মিত টাকা পাঠাই আমি। কিন্তু টাকার বাইরে আর যা কিছু তা কী করে দেব, কেমন করে দেব, ওরা কি নেবে! ওরা তো আমায় বোঝে না। যা ওদের ভালর জন্যেও বলি,-ওরা ভাবে আমি টাকা দিই বলে শাসন করছি। মতের বিরোধ মাত্রকেই আমার কর্তৃত্বপ্রিয়তা বলে মনে করে। অথচ ওদের সব কিছুকে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুভ-র আজকের এই ওয়াগন ভাঙ্গার সূচনা তো আমি আগেই দেখেছি, থামাতেও চেষ্টা করেছি, পারি নি। মা-ও যেন আমার বিরুদ্ধে ছিলেন। বাড়ীতে যেন অনেক দিন থেকে দুটো দল হয়ে গেছে। একদিকে আমি, অন্যদিকে আমার মা-ভাই-বোন।

রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। মা তার সন্তানকে স্বাভাবিক, সৎ রাখতে পারে নি। আমারও সন্তান আসছে। আমিই কি পারব?

কিন্তু তাকে রাখব কিনা সে চিন্তারই এখনও মীমাংসা হয় নি। কোন চিন্তারই মীমাংসা হয় না। কোন এক দিন টোপন নামে একটি ছেলে ছিল এই পৃথিবীতে। আমি কি টোপনকে ভালবাসতাম? কতটা বাসতাম? আমার এই অজাত সন্তানের চেয়ে বেশি? না, কম। অহেতুক চিন্তা। টোপন নেই। কোনদিনই আর থাকবে না। আমার সন্তান আছে, আসছে। তার জন্য এই পৃথিবীতে একটু ঠাঁই দরকার। মা জানে না, আমিও মা হতে চলেছি। মাকে এ কথা বলাও যাবে না।

রাস্তা দিয়ে একটা দল আসছে। খুব হৈচৈ করছে। হো হো করে হাসছে। ছেলের দল। একটি মেয়েও আছে। জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে বন্ধুরা ও বান্ধবী। আমরা রাস্তায় আগে এতটা হো-হো করাটা অশালীনতা মনে করতাম—মেয়েদের পক্ষে তো বটেই। আজকাল না করলেও চলে। বয়স হচ্ছে, এবং হয়তো রক্ষণশীল হয়ে যাচ্ছি।

দলটা কাছে আসতে দেখা গেল নন্তে-হাবলুর দল ও বন্দনা।

বন্দনা বলল, 'দিদি!'

নন্তে মুখ থেকে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'বাড়ী থেকে আসছ? শুনেছ সব?' বলল বন্দনা।

'হ্যাঁ।'

'থানায় গিয়েছিলাম। ছাড়লে না। খুব ঝগড়া করে এসেছি।'

'ঝগড়া? কী ঝগড়া?'

'খুব ঝগড়া দিদি।' বললে নন্তে। 'পুলিস ব্যাটাদের খুব শুনিয়ে দিয়ে এস্‌চি। শুভ-কে ছাড়বেই না যখন তখন ওদেরই বা আমরা ছাড়ব কেন?'

ছেলেগুলো পরেছে ফুলপ্যাণ্ট, কিন্তু সবাই গুটিয়েছে এক-চতুর্থাংশ। চোখে-মুখে সুরুচির ছাপ নেই। চুলগুলো অ্যালবার্ট কাটা। আমি দেখছিলাম ওদের। ওরা কেউ দেখছিল আমাকে,

কেউ পেছন থেকে দেখছিল বন্দনাকে। বন্দনা তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। ও অস্বস্তি বোধ করছিল। শেষটায় ও বলল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ, দিদি ?'

'শক্তির কাছে।'

'ছোড়দার ব্যাপারে ?'

'হ্যাঁ। তুই বাড়ী চলে যা।'

বন্দনা এবং সেই সঙ্গে দলটা গতি নিল।

বললাম, 'তোমাদের একজন একটু আমার সঙ্গে চল ভাই। অনেক আগে এসেছি—এই অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।'

নন্তে এলো আমার সঙ্গে। বাকীরা চলে গেল কোলাহল আর খুশীর ঢেউ তুলে। মনে হলো না, ওরা একটা অসুবিধা কাঁধে করে বেরিয়েছে। মনে হলো, উৎসবে এসেছে। বন্দনার গলা দূর থেকেও শুনতে পাচ্ছি।

'শক্তিদার কাছে কী জন্যে ?' নন্তে সঙ্গে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল।

শক্তি এখানকার রাজনৈতিক কর্মী। আমার সঙ্গে আলাপ আছে। ওকে ভেলা ধরে শুভ-র উদ্দেশে বেরোব।

'সুভ-টা আজ একটুর জন্যে ধরা পড়ে গেল, দিদি। আমরা সবাই তো ছিলুম। ধরা পড়ল গিয়ে ও। পুলিস বোধ হয় আগে থাকতে ঠাওর করেছিল। তক্কে তক্কে ছিল সালারা। কোন দিন এমন হয় না। আজ—ব্যস্।'

শক্তিকে পেয়ে গেলাম বাড়ীতে। আগে যখন রাজনীতির সঙ্গে যোগ ছিল, তখন শক্তির সঙ্গে পরিচয়। সে এখানকার একজন রাজনৈতিক কর্মী। মনে হলো, ও কিছু সাহায্য করতে পারে। শক্তিকে বললাম সব।

নন্তে বলল, 'বাই চান্স্ ধরা পড়ে গেল, সক্তিদা।'

'তুই কি করে জানলি ? দলে ছিলিস্ বুঝি ?'

নস্তে কানে হাত দিয়ে বলল, 'মাইরি না, সক্তিদা।'

আমি বললাম, 'নস্তে, তুমি বাড়ী যাও।'

নস্তে চলে যেতে শক্তি বলল, 'এই এরা আজকাল খুব বাড়িয়েছে চন্দনাদি। সাইডিং-এ মালগাড়ী পড়ে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে তো মাল খালাস হয় না। এরা— এই নস্তেরা রাতে ভাঙ্গে।'

'পুলিশ থাকে না?'

'রেল-পুলিশ থাকে। তাদের চোখে ধূলো দেয়, অথবা হয়তো বখরা করে—জানি না ঠিক।'

'শুভও ঐ দলে ভিড়েছে।'

'আমার মনে হয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু কাকে বলি কথাটা, আপনি তো ছিলেন না এখানে।'

থানায় পুলিশ অফিসার মোটামুটি ভদ্র ব্যবহারই করল, বলল, 'এখন ছাড়া যাবে না। এক হতে পারে, যদি কোন খুব বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজে দায়িত্ব নেন, যেমন ধরুন, এখানকার এম, এল, এ, —উনি তো সরকার পক্ষের, উনি যদি দায়িত্ব নেন—'

শক্তিকে পাশে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'যাব নাকি এম, এল, এ,-র কাছে?'

'অনেক রাত হয়ে গেছে।'

'তবু যাই।' মা-র কাছে একা ফিরতে আমার ভয় হচ্ছিল।

'গিয়ে কোন লাভ নেই, চন্দনাদি।'

'কেন?'

'উনি রাতে একটু মদ-টদ খান। বেরোতে চাইবেন না।'

অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি?'

'না। আপনি ইচ্ছে করলে খাবার দিয়ে যেতে পারেন, আমরা দিয়ে দেব।'

'আচ্ছা, আমি বাড়ী থেকে নিয়ে আসি।' ভাবলাম, মার কাছ থেকে আনব।

'না। অত দেরী করতে পারব না। এমনিতেই রাত অনেক হয়ে গেছে। এখান থেকেই কিছু কিনে দিন না।'

তাই দিলাম। আর এই হঠাৎ মনে হলো যে আমি বহুক্ষণ কিছু খাই নি—একটু জলও নয়। হঠাৎ আমি দুর্বল বোধ করলাম। আমার মাথাটা একটু ঘুরে গেল। এ অবস্থায় এরকম এমনিই হতে পারে। তায় এই হাঙ্গামা। এখন না খেয়ে থাকবার আমার কোন অধিকার নেই। আমি মানে যে এখন আমরা দুজন।

কোন রকমে সামলে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

শেখর, ফেরার পথে মনে হলো, কী হবে সন্তান দিয়ে। সে হয়তো আর একজন শুভ হবে। শুভ আমারই ভাই। খুব স্পষ্ট-ভাবে পরিচয়টা দিতে হয়েছিল পুলিশ অফিসারের কাছে। ঘুরে-ফিরে সেই কথাটাই মনে হচ্ছে।

'চন্দনাদি। একটা কথা বলি?'

'বল।'

'কথাটা—কিছু যদি মনে না করেন—আপনার বোন বন্দনা সম্পর্কে।'

'কী?'

'ও খুব খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মেশে—মানে বড্ডো বেশি মেশে। মানে এমন একটা ধরনে মেশে যে—'

'যার দাদা ওয়াগন ভাঙ্গে, সে খারাপ ছেলের সঙ্গে মিশবে না তো কার সঙ্গে মিশবে, ভাই?' বড় দুঃখে মুখ দিয়ে কথা কটা বেরোল।

শক্তি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি বলছিলাম আমাদের দলের দিক থেকে।'

'দল মানে?'

'পার্টি।'

'পার্টির সঙ্গে বন্দনার কী সম্পর্ক?'

'কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আপনাকে তো আমাদের লোক বলেই সবাই জানে। সেই বাড়ীর কোন কিছু হলে পার্টিও দুর্ণামের ভাগী হয়ে পড়ে।'

'বাড়ী-টাড়ী আর আজকাল কোথা! যে যার মত সব।'

'তবু—আমি বলছিলাম—পার্টির সুনামের কথা ভেবে—'

'মানুষই যদি যায় সব নষ্ট হয়ে, তবে আর পার্টির সুনাম দিয়ে কী হবে, ভাই!'

॥ শেখর ॥

চন্দনা সহরতলীর বাসে চাপবার পর শেখর খানিকক্ষণ ঐখানে দাঁড়িয়ে রইল। দেহটা কমজোর মনে হচ্ছে। মাথাটাও তাই। চন্দনার সন্তান হবে। শেখরের সন্তান। পুরো যেন ঘটনাটাকে বুঝে উঠতেই পারছিল না শেখর। কী ধরনের অনুভূতি আসবার কথা এখন? আনন্দ! অবস্থাটা অস্বাভাবিক। অবিবাহিত তারা, আর ওদিকে টোপনের স্মৃতি। তার ভয়ংকর আনন্দ কিছু হচ্ছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে যে টোপনের ছোট ভাই তাকে মুক্তি দিতে আসছে। এতদিন যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব শেখর আর চন্দনার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দাঁড়িয়েছিল, তা এবার শেষ হবে। নতুন চেষ্টা সুরু করতে হবে নতুন জীবন গড়বার জন্য। কারণ, হত্যা সে ঘটতে দেবে না।

মনের উজ্জ্বল একটা রসিক অংশ ফক্কড় ছোকরার মত ফিকফিক করে হাসল, বলল, 'টোপনের ছোট ভাই কান ধরে সব করিয়ে নেবে। সে আসছে।'

শেখর দেখতে পেল ঘোড়ায় চড়ে একটি শিশু আসছে। রকিং হর্স। টোপনের ছোট ভাই—বারবার সে আওড়াল কথাটা।

টোপনের স্মৃতির অসংখ্য টুকরো মনের নানা যায়গায় জড় করা আছে। একবার এক একটা দেখা দিচ্ছে। যেন এক একটা টোপন।

আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল শেখর। কোথায় যাবে সে! আজ কোথাও তার ভাল লাগবে না। চাইছেও না সে কোথাও যেতে। একটু নিজের কাছেই থাক। নিজে অবশ্য নানা চিন্তার ভার বয়ে বয়ে অবসন্ন।

বিয়ে! আবার বিয়ে করবে সে! চন্দনাকে! আনন্দ হওয়া উচিৎ। কিন্তু এক বিবাহের স্মৃতি তাকে আতঙ্কিত করে রেখে গেছে। ভালবাসাকে সামাজিক আধারে আনতে, বিবাহের মধ্যে আকার দিতে কি একালে সবাই অপারগ! না, এত নৈরাশ্যবাদী হওয়ার কারণ নেই। ঘরপোড়া গরু! চন্দনায় আশঙ্কা নেই।

চন্দনার ও তার সন্তান তো উভয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সূক্ষ্মচিন্তার বিলাস আপাতত তোলা থাক। বেশ পরিষ্কার কঠিন মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দুষ্টুটার কী মজা!

'কী হে ভাবুকপ্রবর, চললে কোথায়?'

নাড়া খেয়ে গেল মনটা, দেহটাও।

দ্বিজেন শেখরের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল। ও ভাল স্পোর্টসম্যান ছিল ছাত্রজীবনে। বেশ শক্তিমান ঝাঁকুনি।

'দেখতে পাচ্ছিস না আমাকে। ডাকলুম, তা শুনতে পাস না। কী ব্যাপার? আর এদিকে তো দেখা-সাক্ষাৎ করিস না বন্ধুদের সঙ্গে এক যুগ। অন্য বন্ধুদের কথা জানি না। আমার সঙ্গে তোর লাস্ট কবে দেখা হয়েছে বল তো। আচ্ছা, আচ্ছা, উত্তরটার জন্য অত ভাবতে হবে না। চল্ আমার বাড়ী। আমার বৌর হাতের এক কাপ চা খেয়ে ভাবতে লেগে যাবি চল। আমার বৌ সুন্দরী, আশা করি মনে আছে। হ্যাঁ, দুটি সন্তাদের জননী হওয়া সত্ত্বেও

—স্বাস্থ্যবতী। সুতরাং তার হাতের চা—চল্ চল্ কামিনী-কাঞ্চন-বৈরাগী। কোন কথা শুনব না। নিজের কামিনীটিকে তো বিচ্ছেদের অতল তলে তলিয়ে দিলি, এখন কোন্ দরিয়ায় ভাসবি ভাসছিস? আরে দূর! পুরুষ মানুষের বিয়ে একটা চাই-ই। বিয়ে বা—আরে সে তোর দ্বারা হবে না।'

শেখর এল দ্বিজেনের বাড়ীতে। সুন্দর, পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন। ওর বাড়ীর অবস্থা বরাবরই ভাল। ও নিজেও ভাল চাকরী জুটিয়েছে। অভাব নেই সংসারে। হয়তো অন্য কোন সমস্যাও নেই।

দ্বিজেন বলল, 'আমার কথাগুলো ভাল্‌গার লাগল?'

'না। তা—'

'অর্থাৎ লেগেছে। দ্যাট্‌স্ গুড্। দ্যাখ শেখর, মাঝে মাঝে আমার প্রচণ্ড ভালগার হতে ইচ্ছে করে। খিস্তি, খুব কাঁচা খিস্তি করতে ইচ্ছে করে। হ্যাঁ কাজেও তাই। মনে হয়, সারা দুনিয়াটাই ভাল্‌গার্, কিন্তু ওপরে পালিশ বজায় রেখেছে। আমিও তাই। তুইও তাই। ঐ পালিশটা রগড়ে তুলে দেওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে আমার হাতটা এমন নিশপিস করে। অন্য সভ্য ভদ্রলোকের সামনে এটাও বলাও মুস্কিল। অথচ তাদেরই রগড়াতে ইচ্ছে করে আমার বেশি। নিজেকেও রগড়ে সব ছাড়িয়ে নিছক আমার যে ভালগার রূপ সেটাকে দেখাতে ইচ্ছে করে—র‍্যাদার দেখতে ইচ্ছে করে। আমাকে, বা অন্য ভদ্র লোকদেরও তখন নিশ্চয়ই ছাল-ছাড়ানো বুড়ো গরুর মত দেখতে হবে। লাল-লাল, শক্ত লম্বা আঁশ, বাসী শুকনো রক্তের একটা অস্বাস্থ্যকর গন্ধ।'

দ্বিজেনের বৌ ঊর্মিমালা এসে দাঁড়াল। সুন্দর। সত্যি। বোঝা যায় না দুটি সন্তানের মা বলে। দেহের ভাঁজে ভাঁজে এখনও রয়েছে মাদকতা। দ্বিজেন ঠিকই বলেছে।

'কত দিন বাদে এলেন বলুন তো।' সুন্দর গ্রীবা তুলল, সুন্দর কণ্ঠে সঙ্গীতের মত অভিযোগ বেজে উঠল।

'বসুন।' বলল শেখর।

এগিয়ে এসে সোফায় বসল উর্মি। তরঙ্গ উঠল দেহে। ভঙ্গিতে নৃত্য ভাষা পেয়েছে।

পোষাকে প্রসাধনে কোথাও একটা দাগ নেই যেন। গাল দুটো লাল, আর—এই মুহূর্তে শেখর যদি দ্বিজেনের মত মনে একটু ভালগার হতে চায় তাহলে বলবে গাল দুটো টস্‌টস্‌ করছে। হালকা আঁচল তার বুকের ওপর দিয়ে কোমরের দিকে হারিয়ে গেছে। সেই হারানো আঁচলটা যেখানে কোলে একটু আশ্রয় পেয়েছে সেইখানে উর্মির হাত দুটি। দুধে-আলতা রঙের হাত বেয়ে নিটোল স্বাস্থ্যের লাস্য উঠে গেছে ঘাড় হয়ে গলায়—যেখানে হারানো আঁচলটা আবার ফিরে পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, দ্বিজেন বলতে পারে, বিয়ে ছাড়া পুরুষমানুষের চলে না।

'এবার একটা বিয়ে থা করুন।' কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল সুন্দর কালো চোখে। চোখ দুটো বড় নয়। ছোট, চঞ্চল, ভাষাময়-হয়তো একটু অস্থিরই বলা যায়।

'বল—দ্বিতীয় আর একটা করুন।' যোগ করল দ্বিজেন।

'হ্যাঁ, ভাবছি, করব '

'তাই নাকি?' হাসিতে উল্লাসে উর্মির সারা দেহ কথা বলে উঠ'লে।

'হ্যাঁ।'

'কে? কোন্‌ মেয়ে? চেনা আমাদের? কবে? ওমা!' সারাটা দেহ নানা যায়গায় নানা সুরে কথা কইতে লাগল। উর্মির নরম হালকা চামড়ার তলায় যেন একটা ঘন রস স্থির হয়ে আছে। নড়লেই সেটা এদিক ওদিক ছোটে। তার আভা ফুটে ওঠে চামড়ার ওপরে, প্রসাধনের ওপরেও। ঐটে দেখলেই দ্বিজেনের মত বলা যায়—উর্মি মেয়েটা টস্‌টস্‌ করছে।

মেয়ে ঠিক হয় নি এখনও।' লুকোল শেখর।

'ও হরি!' হতাশ হয়ে সেই রসধারা যে যার যায়গায় চলে গেল।

দ্বিজেন বলল, 'তবে আর কী হবে? ঊর্মি একটু চা কর।'

'চা করছি।' ছোট চোখের বাঁকা আলো শেখরের গায়ে বুলিয়ে বলল ঊর্মি, 'কিন্তু আজ আপনাকে এখানে খেয়ে যেতে হবে।'

'ও শ্যুয়র, শ্যুয়র।' সায় দিল দ্বিজেন '

'আমি—' আপত্তি করল শেখর।

'না, না, কোন ওজর চলবে না।' সেই ছোট চোখ নেচে নেচে বলল কথাগুলো। প্রথমে কোলের ওপর থেকে হাত দুটো, তারপর সারাটা দেহ সেই হারানো আঁচলটার খোঁজে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে নড়ে-চড়ে উঠে, সেই ঘন রসের টসটসে আঁচলটাকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে কাঁধেব ওপর দিয়ে পিঠে নিতম্বে গতিভঙ্গিতে ছড়িয়ে দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

'কী রকম দেখলি?' জিজ্ঞেস করল দ্বিজেন।

'তুই ভাগ্যবান।'

'সবাই তাই বলে। বড় বংশের মেয়ে, গান জানে, বিয়েতে ভাল টাকা দিয়েছে, ভাল কানেকশন্ আছে ওদের পরিবারের, লোরেটোয় শিক্ষার প্রথম ধাপ, দ্বিতীয় ধাপ শান্তিনিকেতনে, শেষ ধাপ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর চেহারা—সে তো দেখলিই।'

দ্বিজেন থামল। তারপর ঘাড়টা একটু এগিয়ে বলল, 'একটু ভালগার হব? স্টিল অ্যাট দীস্ এজ্ শী ইজ অ্যাট্রাক্টিভ্—আই মীন সেক্শুয়ালী। ইজন্ট্ শী?'

'তুই বৌ বৌ করে পাগল হবি।'

'হ্যাঁ, যে কোন দিন এসে দেখবি দ্বিজেন বাগচি পাগল হয়ে গেছে। কেন জানিস্?'

সত্যি দ্বিজেনকে দেখতে অন্য রকম হয়ে গেছে। পাগল না হোক, অন্তত সীরিয়াস্। কিংবা আরো বেশি কিছু।

'শেখর, একটা কথা জিজ্ঞেস করি ভেবে উত্তর দে। তুই উর্মিকে বিয়ে করে তার সঙ্গে দিনের পর দিন ঘর করতে পারবি ?'

'ছি ছি, এ সব কথা কোথা থেকে উঠছে !'

'ও ! পরস্ত্রী ! আচ্ছা, ধর ঠিক ওর মত একটি মেয়ে। ওর যমজ বোন। সব এক। তাহলে ? কথা বলছিস্ না যে ! জানি, তুই পারবি না। আমি নিশ্চিত। শেখর, তুই শুনলে আশ্চর্য হবি, উর্মি অত সুন্দর তো, ওকে নিয়ে আমি পাগল তো—তুই-ই বললি, কিন্তু ওকে আমি ঘেন্না করি। হ্যাঁ ঘেন্না। আমার সারাটা শরীর ওর নাম শুনলে পর্যন্ত কিরকম গা-ঘিন-ঘিন একটা ভাব করে ওঠে। এলার্জি বলতে পারিস।'

'সে কী ! ঘেন্না ! ঘেন্না করিস কেন ?'

এলার্জির কোন কারণ ডাক্তাররাই বলতে পারে না, আমি তো ছার।' তিক্ত হেসে বলল দ্বিজেন। 'আমরা একটা বিশেষ মেয়েকে ভালবাসি কেন কেউ বলতে পারে ? পারে না। ওটা রক্তে-মাংসে ও অচেতন-অবচেতনে প্রায় পুরোটা জন্মায়। তার পরে তার নানা গুণ খুঁজে বার করে বলি—হ্যাঁ, এই গুণের জন্য ভালবাসি। আমরা সবাই জানি, অকারণ ভালবাসাটাকে ঐ বলে বেশ যুক্তির ওপর দাঁড় করাতে চাই আমরা। ঘেন্নাও ঠিক ঐ রকম। ঘেন্না করি তো করি। কেন করি—তার উত্তর হয় না। ভালবাসা যেমন আসে, ভেতর থেকে আসে, ঘেন্নাও তেমনি ভেতর থেকে আসে, বাধা মানে না, যুক্তি মানে না। তবু এর মধ্যে যুক্তি আনতে হলে বলব যে ওর সঙ্গে আমার একেবারে মেলে না, তাই—'

'আশ্চর্য !' এর বেশি কোন কথা শেখরের মুখ দিয়ে বেরোল না।

'এখানেই আশ্চর্যের শেষ নয় রে, শেখর। এর চেয়েও বড় আশ্চর্য আছে। রাত্রে যখন জগতের সব আলো নিভে আদিম অন্ধকার খেলা করে, তখন উর্মির আর কিছু আমার মনে থাকে না,

শুধু একটা রক্ত মাংসের প্রচণ্ড যৌনশক্তিসম্পন্ন আদিম নারী। আমি ওকে ভেঙ্গে-চূরে ওর মধ্যে ডুবে যাই। প্রতি রোম কূপে আনন্দ-উত্তেজনার তীব্র শিহরণ নিঃশব্দ ঝড়ের মত বইতে থাকে। তারপর সকালে উঠে দিনের আলোয় আবার আমরা দুজনে দুজনকে ঘৃণা করি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই চলছে। এতে পাগল হয়ে যাওয়ারই কথা। তবে সান্ত্বনা এই যে এ ঘটনা বহু দম্পতির জীবনে আছে, আমাদের একার নয়। হয়তো আমাদের মত তীব্র নয়, তবু আছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, আমাদেরও তুই কিছু বুঝতে পারিস নি।'

'ঊর্মির অ্যাটিচ্যুড্ কী?'

'হুবহু এক। ও আমাকে বিয়ে করেছিল কেন জানিস? আমি নাকি খুব সেক্শুয়্যালি অ্যাট্রাকটিভ—ও নিজেই বলেছে আমাকে। আর এখন ওর অবস্থাও ঠিক আমারই মত। দিনে আমরা কেউ প্রায় কারো সঙ্গে দায়ে না পড়লে কথাই বলি না। ছায়া মাড়াই না। আর রাত যত কালো হয়ে ওঠে তত আমরা চঞ্চল হয়ে উঠি। এ যে কী শাস্তি তোর ধারণা নেই শেখর। আচ্ছা, রুমীকে তুই ঘেন্না করতিস্?'

'না। ঠিক ঘেন্না নয়। বিরাগ। বিরূপতা।'

'আচ্ছা, ঐ অবসরে ওর সঙ্গে কোনদিন দেহসম্পর্ক করেছিস?'

'বিরাগটা একদিনেই চূড়ান্ত হয়ে দেখা দেয় নি তো। যখন একটু একটু করে জমছিল, তখন হয়েছে বৈকি! পরে যখন বিরাগটা দানা বেঁধে উঠেছে, তখন আর হয় নি।'

'ঐ দানা-বাঁধা বিরাগটা ধর আরও এক শো গুণ বেশি হলো তোর। তারপর ঐ রকম একটা সম্পর্ক—পুরো—করতে হলো তোকে। বাইরের কারো হুকুমে নয়, তোরই রক্ত মাংসের হুকুমে। একদিন নয়, দু'দিন নয়, রোজ। দিনে ঘৃণা, রাতে মৈথুন। এর থেকে মুক্তি নেই তোর। ভাব তো। কী সাংঘাতিক।'

হ্যাঁ, সাংঘাতিক। কিন্তু শেখর আর এখন রুমীর কথা ভাববে না। কোন রকম সম্পর্কের কথাই নয়। রুমী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক তার জীবন থেকে। যে একটি মাত্র বন্ধনে রুমী ডিভোর্সের পরেও তার কাছে জীবন্ত ছিল, সেই বন্ধন চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং রুমীর আর থাকবার দরকার নেই তার জীবনে বা মনে বা কোন চিন্তায়। টোপনের মৃত্যুর পর থেকে শেখর রুমীর নামটা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না।

চন্দনা হয়তো এতক্ষণ পৌঁছে গেছে। আর আমাকে এখন এই দ্বিজেন আমার সঙ্গে রুমীর দেহ-সম্পর্কের কথা ভাবাচ্ছে। চন্দনাও একটা সমস্যা। তা হোক্, সে খুব সরল পথে সমস্যাটার সমাধান করবে।

দ্বিজেন-উর্মির মধ্যে এই মুহূর্তে বিয়ের একটা উৎকট রূপ সে দেখতে পাচ্ছে।

'একেবারে চুপ যে! কী ভাবছিস্?'

'ভাবছি—যদি সত্যি এই অবস্থা—তাহলে—'

'ডিভোর্স?'

'অন্তত ভেবে দেখতে হয়।'

'ভেবেছি। অনেক। কিন্তু সে সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'পারি না। ঐ যে বললাম—রাতের নেশা। দিনের বেলায় পারব। রাতে পারব না। নিজেরই ওপর ঘেন্না হয় তাতে। আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু—।'

'একদিক থেকে সেটা ভালই হয়েছে।'

'কোন্ দিক থেকে?'

'বাচ্চাগুলোর দুরবস্থা হতো ডিভোর্স হলে।'

'তুই ডিভোর্স করেছিস তো তাই তুই ঐ কথা ভাবছিস্। ডিভোর্স না করেই কি আমরা বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতে পারব

ভেবেছিস ? পারব না। ওরা ঠিক বুঝবে। আমার বড় মেয়েটা তো বোধহয় এখনই একটু একটু বোঝে। বাচ্চাদের আমরা যত নির্বোধ ভাবি, ওরা তা নয় রে শেখর। ওরা অবোধ জন্তুর মত প্রায় শুঁকে শুঁকে সব বুঝে ফেলে। যেদিন ওরা ওদের বাবা-মার সম্পর্কের এই ইতিহাস জানবে সেদিন আমাদের কী ঘেন্নাটা করবে ভাবতে পারিস্! আর এই ছড়িয়ে যাবে। ওরা কাউকেই শ্রদ্ধা করতে পারবে না। নিজেদেরও বোধহয় ঘেন্না করবে। নিজেদের সব সম্পর্ককে—বন্ধুত্ব থেকে দাম্পত্য—সব কিছুকে ওরা দেখবে ঘেন্নার চোখে। অ্যাবনর্মাল্ হয়ে যাবে ধরনটা। সুতরাং উদ্ধার নেই, শেখর।'

চা এল। উর্মি এল।

'কী কথা হচ্ছিল ?' জিজ্ঞেস করল উর্মি।

'পুরোনো বন্ধুদের কথা।' বলল দ্বিজেন।

চা খাওয়া হলো। পুরোনো বন্ধুদের খবরের আদানপ্রদান হতে লাগল।

শেখর দেখছিল উর্মিকে। উর্মির প্রতিটি প্রত্যঙ্গ আলাদা আলাদা করে। আর দ্বিজেনের কথাগুলো মেলাচ্ছিল।

এক সময় উর্মি বলল, 'দেখি খাবারের কত দূর।'

উঠে গেল—ঠিক আগের বারের মত ভঙ্গিতে।

দ্বিজেন বলল, 'সারদিন ঘৃণা করি। রাতে যখন মুখোমুখি খেতে বসি তখনও। তারপর খাওয়া যখন শেষের দিকে আসতে থাকে তখন ঘৃণা করতে করতেও আমাদের চঞ্চলতা জাগে। দুজনেই সেটা জানি। এর পরেই যে আমরা চলে যাব শোবার ঘরে—আলো নিভিয়ে কালো অন্ধকারের মধ্যে। বাচ্চারা যদি কোন দিন হঠাৎ কোন কারণে বেশি জেগে থাকে, আমরা কী বিরক্ত হই, রেগে যাই। দুজনেই।'

ভেতর থেকে খাবার ডাক পড়ল।

দ্বিজেন বীভৎসভাবে হেসে বলল, 'রাজযোটক !'

খাওয়ার সময় সারাক্ষণ শেখর ঊর্মিকে দেখল। হ্যাঁ, একটা ঘন রসপ্রবাহে সে যেন লিপ্ত। মনে হয়, তার গায়ে হাত দিলে পর্যন্ত সেটা ছোঁয়া যাবে যদিও সেটা চামড়ার তলায় বইছে।

খাওয়ার পর বিদায় নিল শেখর।

হাত তুলে নমস্কার করল ঊর্মি। সব রকমের নড়াচড়ার মধ্যে সেই রসপ্রবাহ নাড়া খেয়ে টলমল করে।

দ্বিজেন ওর সঙ্গে এল ওকে এগিয়ে দিতে।

দুজনে এসে বসল একটা পার্কে। এখান থেকে দ্বিজেনের তেতলার ঘরের জানালার চতুষ্কোণ আলো দেখা যায়।

'কী করি বল্ তো। অসহ্য হয়ে উঠেছে দিন দিন।' বলল দ্বিজেন।

শেখর ভাবল, চন্দনা হয়তো এখন খেয়ে শুতে গেছে। এবং দুশ্চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না তার। দ্বিজেনের কাহিনী শুনলে আরো দুশ্চিন্তা বাড়ত। শেখর এই মুহূর্তে আর কিছু ভাবতে চাইছে না। পারছে না। বলল, 'আমি জানি না রে দ্বিজেন, কী করা উচিৎ।'

কিছুক্ষণ ওরা চুপচাপ বসে রইল। তারপর দ্বিজেন বলল, 'আমি যাই। উর্মি হয়তো বসে আছে।'

দ্বিজেন চলে গেল। একটু পরে দ্বিজেনের তেতলার ঘরের জানালার চতুষ্কোণ অলো নিভে গেল।

শেখর পার্কের ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস। আলোটা নিভে যাওয়ায় এই প্রথম চোখে পড়ল হালকা আলোকিত আকাশের পটে তেতলার ঘরের অন্ধকার বহিঃরেখা।

রাত। ট্রেন চলছে। দিল্লী থেকে কলকাতা। কামরায় সবাই ঘুমোচ্ছে। আমার ঘুম নেই। ভাল করে ঘুমোই না এখন—ঘুম আসে না। ভাল করে যেন জেগেও থাকি না। মনটা কেমন জড়বস্তুর মত হয়ে রয়েছে।

এই রাস্তা দিয়েই আমরা দিল্লী গিয়েছিলাম। আমরা দু'জন। এখন ফিরছি একা। সেদিন টোপরের জ্বর ছিল।

ট্রেনের জানালা দিয়ে অন্ধকারগুলো ছুটছে। ওরই কোন একটা অন্ধকারের মধ্যে কি টোপন লুকিয়ে আছে এখন! মৃত্যুর পর মানুষের কী হয়! আমার সব সময় মনে হয়, টোপন আছে, আছে আমারই খুব কাছে। ও আমায় দেখতে পাচ্ছে। আমার জন্যেও ওর কষ্ট হচ্ছে। আমি কি ভাবছি তাও ও জানতে পারছে সর্ব। ও দেখা দেয় না, কথা বলে না। আমি ওকে পাই না।

শেখর কী ঘৃণার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল। ও যেন আমাকে দায়ী করছিল টোপনের মৃত্যুর জন্য। ওর চোখে সেই কথাটা ছিল। চোখ দিয়ে ও বিঁধছিল আমাকে। ও বরাবরই আমাকে ঘৃণা করে, অন্যান্য দিন সেটাকে একটু ঢেকে রাখে—ভদ্র-লোক তো, আবার তার পর হিউম্যানিস্ট! কিন্তু সেদিন ও যেন আমায় ওর ঘৃণার আগুনে পুড়িয়ে মারতে চাইছিল। ও বোঝে না, টোপনের মৃত্যু আমি কেন ঘটাতে চাইব। হ্যাঁ, ওর কাছ থেকে টোপনকে সরাতে চেয়েছি, সে তো সবাই জানে। কিন্তু মৃত্যু—টোপনের! ও কি করে ভাবল এ কথা! আমি যত ঘৃণ্যই হই ওর চোখে, তবু তো আমি মা। এই মর্যাদাটুকুও ও আমাকে দিল না!

কিন্তু ওর কথা ভাবছিই বা কেন। ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক তো আমার শেষ হয়ে গেছে। ডিভোর্সের পরেও টোপন মারফৎ সম্পর্কটা টিঁকে ছিল। টোপন বেঁচে থাকলে চিরকাল সেটা কোন না কোন ভাবে টিঁকে থাকত। সম্পর্কটা টোপনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। টোপন যেন এই টানাটানির মধ্যে থাকতে পারছিল না।

॥ চন্দনা ॥

ব্যর্থ হয়ে বাড়ী ফিরলাম। মাকে বললাম সব কথা। মা আমার কথা বোধহয় পুরো বিশ্বাস করল না। আমি যে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি এটাই মা মানল কিনা কে জানে।

'খিদেয় মরছে ছেলেটা।' মা-র গলায় কিসের একটা ঝাঁঝ ছিল।

তাড়াতাড়ি বললাম, 'খাবার কিনে দিয়ে এসেছি।'

'কিনে?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে যে তার খাবার পড়ে রইল।'

'আমি বলেছিলাম। পুলিশ রাজি হলো না।'

একটু চুপ করে থেকে মা বলল, 'নাও, তুমি খেয়ে নাও।'

আমি খিদেয় তেষ্টায় দুশ্চিন্তায় পরিশ্রমে অর্ধমৃত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু মা-র কথার সুরে খাওয়ার ইচ্ছে রইল না।।

মাকে বললাম, 'তুমিও চারটি খেয়ে নাও।'

'না, আমি আজ আর কিছু খাব না।'

মা গিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমারও আর খাওয়া হলো না। একগ্লাস জল খেয়ে মা-র পাশে শুয়ে পড়লাম।

একদিন মা আর আমি ছিলাম নিকটতম দুটি মানুষ—পরস্পরের সব থেকে বড় বন্ধু। এখন আমাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। মা তাঁর ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন। আমি বোধহয় সে তালিকা থেকে প্রায় এক রকম বাদ পড়েই গিয়েছি। মা-র আমার সম্পর্কে কী রকম একটা রাগ-রাগ মনোভাব।

এই রকম একটা শয্যায় শুয়ে আমার ঘুম আসে না, শেখর। কবে আমি তোমার কাছে চলে যেতে পারব। এ সংসারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের সূত্রটা খুঁজে পাই না। মাসান্তে কিছু টাকা দিয়ে এদের খাদ্যের সংস্থান করি, কর্তব্য করি। বাবা আর দাদার কাছ থেকে একদিন যে কর্তব্য নিজেই মাথায় তুলে নিয়েছিলাম তার মাধুর্য ও বেদনা আজ কমে গেছে, শেখর! আমি এদের আর কী করতে পারব। এই শুভ-র, এই বন্দনার, অথবা মার! কিছু না। যে যার পথে চলে যাবে। নিজের ইচ্ছে মত। আমিও তাই। আমি আমার সন্তান নিয়ে স্বামী নিয়ে অন্য জগতে চলে যাব। এখানে এখন আর আমার ভাল লাগে না। হোক দায়ে পড়ে তোমাকে এ-গ্রহণ, তবু সেও এই শ্বাসরোধী আবহাওয়ার থেকে ভাল। আমি তো তবু তোমারই কাছে যাব, শেখর। আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব। পাটনার নির্বাসন থেকে চলে আসব।

হঠাৎ মনে হলো, মা কাঁদছে।

'মা, কাঁদছ?'

'কাঁদছি রে। আর আমি পারছি না রে চন্দন। টাকা ছাড়বার পর থেকে আর আমার কপালে সুখ লেখে নি ভগবান। একের পর এক কত কিছু। তবু তুই ছিলি তখন কাছে। এখন

এই তো এদের নিয়ে আছি। কিন্তু এরা তো আমার কাছে নেই। এরা তো নিজেকে নিয়ে আছে। কেউ চুরি করছে। কেউ ছেলে-দের সঙ্গে হো-হো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'তুমি কিছু বল না কেন ?'

'বলেছি। অনেক বলেছি। বলে বলে তেতো হয়ে গেছে সম্পর্ক।'

'আমিও তো চেষ্টা করেছি।'

'পাঁচশো মাইল দূরে বসে চেষ্টা করলে হয় না।'

'এখানে থাকলেই কি হতো ? তুমি তো ছিলে।'

'এত হাল-ছাড়া মেয়ে তুই আগে ছিলি না।'

আমি চুপ করে রইলাম। মা ইদানীং আমার সঙ্গে প্রায় কথাই বলত না—নিতান্ত দু'একটা কাজের কথা ছাড়া। আজ হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে সেই প্রথম কোলকাতায় আসা দিনগুলোর মত কাছে এসে গেছে। তখন কত দিন আমরা দুজন পাশাপাশি শুয়ে গভীর রাত পর্যন্ত সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বলেছি। কত সুখের অনুভূতি শুধু আমাদের দুজনের মধ্যে দিয়েই বয়ে গেছে। কত ব্যর্থতা ও বেদনাকে কেবল আমরা দুটি মানুষ বুক পেতে গ্রহণ করেছি। আমাদের কোন কথা অন্যের কাছে গোপন ছিল না। আর আজ ? মা কাঁদছে কিন্তু তার পুরো সাড়া কি আমার মধ্যে আছে ? যে কোন দুঃখে মার সান্ত্বনা ছিলাম আমি। আজ চেষ্টা করলেও আমি তার কোন সান্ত্বনা নই। ছেলের দুঃখে হঠাৎ বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছে বলে এত কথা আমাকে বলছে, নইলে হয়তো বলতো না।

হঠাৎ মা কান্নার মধ্যেই বলল, 'হবে না, আর কিছু হবে না।

আগে হলে মাকে আমি জড়িয়ে ধরতে পারতাম, তার কোলের মধ্যে চলে যেতে পারতাম, তাকে আমার কোলের মধ্যে এনে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে পারতাম, আজ আমি প্রায় কিছুই পারি

না। এবং এও সত্য যে এর একটা কিছু করলে মা বিরক্ত হতে পারে বা রেগে যেতে পারে।

'হবে না। ভেবেছিলাম, সংসারটাকে গড়ে দিয়ে যাব। বার্মায় গুছিয়ে এনেছিলাম। যুদ্ধ ভিক্ষুক করে দিয়ে গেল। ঢাকায় একটু বসতে না বসতেই রায়ট্। আগুন লেগে গেল কপালে। উনি গেলেন, খোকন গেল। তারপর কোলকাতায় কী কষ্টে কেটেছে। তার পর তুই গেলি। শুভটাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। ও-ও গেল। চন্দনা যে কোনদিন যাবে। বিলটুও শুভ-র সাকরেদ হয়ে যাবে। কেউ রইল না। এ সংসারের কেউ নেই। আমার কেউ নেই।' বিড় বিড় করে বলতে লাগল মা।

বলতে ইচ্ছে করল, 'আবার সব হবে, মা।' ঠাট্টার মত শোনাবে বলে বলতে পারলাম না। কথাটা যে ভয়ঙ্কর মিথ্যে। আর হবে না। এই মুহূর্তে বলতে ইচ্ছে করল, 'আমি চেষ্টা করব।' কিন্তু রাতের মায়া কাটলে তো আমি তা পারব না। মা তো ঠিক বলেছে, আমি এ সংসার থেকে প্রায় আলাদা। আমার আলাদা সংসার, শেখর। যেখানে আছি আমি, তুমি, আর আমার ভাবী সন্তান।

সন্তানের সূত্র ধরে দায়ে পড়ে তোমাকে বিয়ে করব! নিজের ওপর ঘেন্না ধরে।

মা কাঁদছিল। এবং আমি মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে পারলাম না। মা-র কান্নাকে ছাপিয়ে আমি আর একটা কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম—আমার মধ্যে। একটি শিশুর কান্না। এই শিশুকে কোথায় আনব? একটা ভাল যায়গারই যেন আমি অভাব বোধ করলাম।

এই ভাবেই সকাল হলো।

স্থানীয় এম, এল, এ-র কৃপায় শুভ মুক্তি পেল। অল্প বয়স, এবং প্রথম অপরাধ—এই অজুহাতে মামলাটা যাতে না রুজু হয় তার ব্যবস্থা করলেন।

মা একটু যেন ঠাণ্ডা হয়েছে। কিন্তু বড় স্তব্ধ। মার মুখ থমথম করছে। শুভ-র সঙ্গেও ভাল করে কথা বলল না।

আমাকে বলল, 'একটা কথা কাল গোলমালে বলতে ভুলে গেছি। সুখেন এসেছে পাকিস্তান থেকে। তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বাড়ীতে কয়েকদিন এসেছে। আজ দুপুরে আসবে।'

সুখেনদা! আমার গা শিরশির করে উঠল। আমার ভয় করতে লাগল। হ্যাঁ, ভয়, শেখর।

॥ শেখর ॥

খানিকক্ষণ শুয়ে পার্ক থেকে উঠল শেখর। পুত্র-বিয়োগ, আর নতুন সন্তানের সমস্যা—কিছুই তার ভাল লাগছে না।

বাড়ীতে ফিরে দেখল একটা চিঠি। যে জুট মিলের ইউনিয়নের সে কর্মী, সেখান থেকে একজন এসেছিল। বসে থেকে না পেয়ে চিঠি লিখে গেছে ঃ'...দিল্লীর ট্রেড ইউনিয়ন কন্‌ফারেন্সে আমাদের ইউনিয়ন থেকে একজনের যাওয়া দরকার। আপনি যান এই আমাদের সবার ইচ্ছে। কাল স্টার্ট করতে হবে। ব্যবস্থাদি করে রাখবেন।...'

'না, না, না। আমি দিল্লী যেতে পারব না।' মনে মনে প্রায় চীৎকার করে উঠল শেখর।

॥ রুমী ॥

কোলকাতা। সব তেমনি আছে। বাড়ী। হাওড়া স্টেশন থেকেই যে কান্নাটা বুকের মধ্যে নতুন করে পাক খাচ্ছিল, তা আর বাড়ীতে এসে বাঁধ মানল না। টোপন, টোপন, এখানে সর্বত্রই তো টোপন। এইখানে আমি শেষ পর্যন্ত একা ফিরলাম।

সেই ঘোড়াটা। রকিং হর্স। শেখরের দেওয়া। আগে রাগ হতো—শেখরের দেওয়া বলেই। এখন এই ঘোড়াটাকেই বড় আপন মনে হলো। ঘোড়াটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। টোপন দিল্লী যাওয়ার পর ও আর চলে নি। দুলিয়ে দিলাম। ও চলতে আরম্ভ করল। ঘোড়াটার আরোহী নেই। শূন্য। হঠাৎ বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। শূন্য—আমি একেবারে শূন্য। আমি এ পৃথিবীতে একা।

আমি জোরে চীৎকার করে কাঁদলাম। এতক্ষণ সভ্যতার নিষেধে তা পারি নি। সেই বন্ধ হয়ে থাকা চীৎকারটা আমার পাঁজরে ধাক্কা মেরে মেরে বেরোতে লাগল।

ওরে টোপন, ফিরে আয়।

॥ চন্দনা ॥

দুপুরে সুখেনদা এল। বলল, 'কী খবর! কেমন আছো? আরে, এত আশ্চর্য হচ্ছো কেন! ওঃ, কত বছর বাদে দেখা বল তো। তুমিও অনেক বড় হয়ে গেছ। দস্তুরমত একজন ভদ্রমহিলা।'

'হ্যাঁ, প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা।'

'না, অতটা নয়।'

'তুমি হঠাৎ?'

'কেন? আসতে নেই? এ দেশ কি শুধু তোমাদের একার?'

'না। তা নয়। কোন কাজে এলে?'

'কাজ! হ্যাঁ। বহু কাজ ওখানে পড়ে আছে। তবু হঠাৎ আসতে হলো। এখানে একটা তার চেয়েও বড় কাজ পড়ে আছে। বহুদিন—বহুদিন ধরে মনে হচ্ছে। মধ্যে জেলে ছিলাম। আসতে পারি নি। ভাবলাম, আর দেরী নয়। আমি এসেছি চন্দনা, তোমার কাছে।'

'আমার কাছে?'

'হ্যাঁ। তোমার। মানে, তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। একটু বেরোবে?'

'চল।'

আমার বুক কাঁপছিল, শেখর। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার কৈশোরে সঞ্চিত মৃত্যু আমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি যে অন্য জীবনকে আঁকড়ে ধরেছি, অন্য জীবন যে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, সংবর্ধিত হচ্ছে।

বেরোলাম। সুখেনদা উঠেছে ওর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। তাদের বাড়ীতে সুখেনদার ঘরে এলাম।

ফর্সা, লম্বা, চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। দীর্ঘদিনের অনিয়ম ও পরিশ্রমে একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ধরন মুখে ও গালে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক জোরালো।

'চন্দনা, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কোথায়?'

'আমার সঙ্গে। যেখানে হোক।'

শেখর, এত জোরে ও ডাক দেয় যে আমার মৃত কৈশোরটা পর্যন্ত যেন তার কবরের মধ্যে নড়েচড়ে ওঠে।

'না, সে হয় না।'

'কেন ?'

'হয় না। এর পর কথা নেই।'

'আছে।' ও চীৎকার করে বলল।

'আস্তে কথা বল।'

'কথা আছে। কেন হয় না বল।'

'হয় না। আমি অমনভাবে চাইনি তোমাকে। আর—'

'কোন কথা আমি শুনব না, চন্দনা। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। আমার তোমাকে চাই।'

আমার হাত দুটো দু'হাতে ধরে এমনভাবে নাড়াল যেন আমাকে আছড়ে মারবে।

'চন্দনা, চন্দনা।' হঠাৎ আর্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ও চলে এল আমার মুখের ওপর। তারপর আমায় ও সর্বাঙ্গীন আচ্ছন্ন করে ফেলল। ওর মুখের স্পর্শ এলোমেলো পড়তে লাগল আমার মুখে, গালে, কপালে, ঘাড়ে, ঠোঁটে। আমি কাঠের মত হয়ে গেলাম।

তারপর ও ক্লান্ত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলতে লাগল, 'কেন হয় না, কেন হয় না ? আমি যে ঐ আশায় বেঁচে আছি, ঐ আশায় এতদূর ছুটে এসেছি।'

ঝড় থেমে যাওয়ার পর ও বলল, 'আমি দুঃখিত, লজ্জিত। আমি ক্ষমা চাইছি। তুমি কি আর কাউকে ভালবাসো ?'

'সে কথায় আর এখন কি দরকার ?'

'আমাকে ঘৃণা করো না শুধু এইটুকু অনুরোধ। আমিই নিজেকে এখন থেকে ঘৃণা করব।'

'নিজেকে ঘৃণা করবার দরকার নেই। ঠাণ্ডা হয়ে ভাল ভাবে

ভেবে যা হয় কর। তোমার রাজনীতির অনেক কাজ আছে বলছিলে। তা ছাড়া তুমি বিয়েও কর।'

'স্টপ্ ছ্যাট্।' চীৎকার করে উঠল সুখেনদা।

শেখর, আমি তখনই বাস ধরে ছুটলাম তোমার কাছে। তোমাকে সব বলতে, তোমার ছায়ায় একটু বসতে, তোমার স্পর্শে অন্য স্পর্শগুলোকে মুছতে—আমি পাগলের মত হয়ে তোমার কাছে এলাম। তুমি ছিলে না ঘরে। সেই ঘর। আগের মতই আছে সব। বই, চেয়ার, টেবিল, বিছানা, সেই আলোর গাছ। আলো জ্বলছে না অবশ্য। এখন দিন বলে। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের কাছে এসে পেঁাছল। আমার অস্থির লাগছে। যখন সুখেনদার ঘটনাটা ঘটে গেছে, তখন বিমূঢ় ছিলাম, এখন তার যন্ত্রণা আমাকে ঘিরে ধরছে। শেখর, আমার দেহের মধ্যে তোমার সন্তান, বাইরে সুখেনদার স্পর্শ। এই মর্মান্তিক দাহ থেকে আমি বাঁচব কী করে?

তোমার সামনে আমি দাঁড়াব কেমন করে? আমার লজ্জা হবে। অপরাধী মনে হবে। কেন আমি অবাঞ্ছিত ঘটনাটাকে এড়াতে পারলাম না। যে কৈফিয়ৎ-ই আমি দিই, যত বিশ্বাসই তুমি কর, তবু আমার জ্বালা ঘুচবে না।

তুমি আসছ না কেন! আমার রাগ হচ্ছে। ঠিক আমার দরকারের মুহূর্তে বরাবরই তোমার কাজ পড়ে দেখেছি। তুমি এসো, আমাকে মারো, আমাকে শাস্তি দাও। তারপর তুমি ভুলে যাও, এই অহেতুক অবাঞ্ছিত ঘটনাটা একেবারে মুছে যাক তোমার কাছ থেকে। তখন আমরা আবার আগের মত হয়ে যাই, তোমার দেহ-স্পর্শের এক অগাধ সমুদ্রে আমাকে শুইয়ে রাখ। রাত্রিদিন, প্রতিটি মুহূর্ত। আমার দেহের প্রতিটি অণু তোমার স্পর্শের স্বাদ আকণ্ঠ পান করে মাতাল হয়ে যাক, অবশ হয়ে থাক। আমাকে নাও, শেখর। ফেলে রেখো না। সরিয়ে দিয়ো না। উদাসীন হয়ে যেয়ো না।

বাইরের যে কোন শব্দে আমি তোমার পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আমি তোমাকে এত আসতে বলছি, অথচ পায়ের শব্দে আমার ভয় হচ্ছে, বুক দ্রুত-স্পন্দনে আমার শ্বাস রুদ্ধ করে দিচ্ছে।

অজাত অচেতন জীবিত যে সত্তা আমার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে—আমার বিবেকের মত, তার কাছ পর্যন্ত কি কলুষের বার্তা পেঁাছে গেল? এই একটা যায়গা যেখানে সবাইকে আত্ম-কলুষের কথা মাথা নিচু করে বলতে হয়ই।

এখন বিয়েকে একটু দূরে সরিয়ে দেওয়া দরকার, এই ধাক্কাটার রেশ একেবারে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা দরকার। কিন্তু সেই অবোধ অজাত শিশু তো তা বুঝবে না। সে তার নিয়মিত পথে অগ্রসর হবে, আবির্ভূত হবে।

তুমি এলে। বললে, 'ও, তুমি এসে গেছ। আমার ফিরতে একটু দেরী হয়ে গেল। দিল্লী পাঠাচ্ছিল আমাকে। সেটা নাকচ করতে গিয়েছিলাম।…কী হলো?'

বলে ফেললাম সব কথা। এক নিঃশ্বাসে।

তুমি স্তব্ধ হয়ে গেলে। একেবারে নিঃসাড়—মৃতের মত। আমার ভয় করতে লাগল। ভয়ে অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। তারপর একটা কিছু বলতে যেতেই তুমি থামালে আমাকে। একটা জ্বালা জ্বলছিল তোমার মধ্যে। মূচড়ে উঠছিল তোমার সারাটা দেহ। যন্ত্রণাটা যেন তোমার দৈহিক। আমি সেই মুহূর্তে তোমার কোন সান্ত্বনা ছিলাম না। আমি ব্যর্থ, আমি ব্যর্থ!

তোমার সারা দেহে মোচড় দিয়ে উঠল একটা কান্না।

॥ শেখর ॥

আমি যে তোমায় সব দিয়েছি চন্দন। আমায় দিতে দাও।

আমি যে সর্বশক্তিতে নিজেকে সংহত করে তোমার কাছে আসছি, আমায় বাধা দিয়ো না, চন্দন।

আমার আশ্রয় যে তুমি, চন্দন। আমার নিরাশ্রয় করো না।

আমি তোমাকে ভালবাসি, চন্দন। আমার ভালবাসাকে অপমান করো না।

আমি যে তোমার সন্তানের পিতা, চন্দন। তার কাছে আমাকে ও নিজেকে ছোট করো না।

॥ চন্দনা ॥

ঢেউটা যখন আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল, মনের স্বাভাবিক ডাঙ্গা ধীরে দেখা দিতে লাগল, তখন মনে হলো বিশ্রীভাবে তারে তারে জড়িয়ে গেছে। সুর বাজছে না। সেই কৈশোরে যখন মনের সুর আপনি বাজে, তখন এসেছিল সুখেনদা। আমার সেই আপনি-বাজা আর সুখেনদার বাজানো একাকার হয়ে রয়েছে আমার মনে। তাকে ভালবেসেছিলাম সন্দেহ নেই। কী ধরনে এবং কতটা, আর কী পরিমাণ তার দায়িত্ব—তা বিচার করি নি। শেখর, তুমি তখন নেই আমার কাছে। সেই যে ঢাকায় একবার দেখা দিয়ে লুপ্ত হয়ে গেলে তার পর দেখা আমরা কোলকাতায় চলে আসবার পরে। আজ যদি সুখেনদা এসে বৃহৎভাবে দাবী করে, তার দায়িত্ব কিছুটা আমারও। আর সেই দায়ে আমি তোমার

কাছেও লজ্জিত শেখর। এও আমার ভাঙ্গনের আর এক পরিচয়। জানতাম আমি। বলেছিও তোমাকে। তুমি বোঝো নি সবটা। আজ যখন চরম একটা সময়ে আমার সেই পরিচয় নগ্নভাবে তোমাকে আঘাত করল, তখনও কি তুমি আমার দুর্বল দরিদ্র রূপটা দেখতে পাচ্ছ না?

শেখর, আমি দরিদ্র, আমি দুর্বল। তোমাকে ধারণ করবার, তোমাকে আবার গড়ে দেবার শক্তি আমি অর্জন করতে পারছি কোথায়!

শেখর, তবু এই কথাটুকু সত্য; বিশ্বাস কর শেখর, আমি প্রাণপণে একটা সুরকে আমার মধ্যে বাজাতে চেষ্টা করছি। কিন্তু তারে তারে জড়িয়ে বেসুরো ও বিস্বাদ ঠেকছে সব।

॥ শেখর ॥

শেখরের মনের কৌতুক-দীপ্ত অংশটা ঝিকিয়ে উঠল, 'কী, অমন মন্ত্রের মত উচ্চারণ করে কী সব বলছ? কাকে ডাকছ?'

'চন্দনাকে।'

'হাসালে। সে তো রয়েছেই।'

'তাকে পাচ্ছি না। আছে কাছেই। তবু তাকে হারাচ্ছি। এ কষ্ট তুমি বুঝবে না।'

'বটে, বটে। বেশ, বুঝলাম না। কিন্তু এটা বুঝি যে তুমি পূর্বে একটি বিয়ে করেছিলে, এবং স্ত্রীর সঙ্গে কিছুকাল বসবাস করেছিলে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। আমার বিচলিত হওয়া সাজে না।'

'সাজা না সাজার প্রশ্ন নয়। চন্দনা তো কোনদিন কথা তোলে নি।'

'হয়তো তোলে নি। কিন্তু কোন দিন ব্যথা পেয়েছে কিনা তা কী করে জানব।'

'ঐ! আবার সূক্ষ্ম চিন্তা সুরু হলো। অন্তত কোন দিন তার পক্ষে তো কোন বাধা হয় নি তোমাকে চাইবার পথে, নেবার পথে।'

'না। তা বোধহয় হয় নি। ঐ ব্যাপারে হয় নি।'

'তবে?'

'হ্যাঁ, ভাববার মত কথা।'

'উঃ জ্বালাতন। ভাবতে ভাবতেই মরবে তুমি।'

'কী করি! মন বলে পদার্থটা যখন রয়েছে।'

'বলি, বয়স তো হয়েছে, না কি?'

'তা হয়েছে।'

'তাহলে মনেও একটু বয়স বাড়লে ভাল হয় না?'

'বাড়া উচিৎ।'

'তিরিশ বছর ধরে একটা মেয়ে পৃথিবীর পথে হেঁটে বেড়াবে, কোথাও কারো সঙ্গে তার গা ছোঁয়াছুঁয়ি হবে না, বা হলে কাঁদতে বসবে, এ যে মনের কিশোর-সুলভ আচরণ।'

'কথাটা সত্যি।'

'আমি সাধারণত সত্যি কথাই বলে থাকি।'

'সব সময় সব সত্যি আমি সইতে পারি না।'

'এটা পারছ মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। তুমি আমার কাছে এসো। আরো একটু শোনাও তোমার কথা।'

'বটে, বটে। আমার ওপর তোমার এত টান! অনেক সময় তো আমায় দূর দূর করে তাড়াও।'

'এখন তাড়াচ্ছি না। তোমাকে চাইছি। তোমাকে ডাকছি। তুমি এসো, এসো। বল। তোমার কথা বল।'

সেদিন ডাক্তারের কাছে যাওয়া হলো না।

পরের দিন গেলাম। ডাক্তারের ঘরে ঢোকার আগের সময় পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় মৃতপ্রায় ছিলাম।

ডাক্তারের সিদ্ধান্তে হঠাৎ জীবন ফিরে পেলাম। ডাক্তার আমায় মুক্তি দিয়েছে। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি নি। ভুল। দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রমে দেহযন্ত্রের একটা সাময়িক অনিয়ম মাত্র। আমার বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু তোমার কাছে ছাড়া আমার বিশ্রাম হবে না, শেখর।

তবু আমি মুক্ত। আমি উল্লসিত। আর একবার আমি আগের জীবনের চন্দনা। আমি স্বাধীন—যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে। যদি কোন কলুষ আমার এসেও থাকে তা স্পর্শ করছে না আমার সন্তানকে।

কিন্তু সত্যিই কি এ আমার উল্লাস? আমার অতিকায় উল্লাসটার তলায় ঝিরঝির করে একটা বেদনার ধারা বইছে, ক্রমেই সেটা নজরে পড়ছে। এক শূন্য মরীচিকা যন্ত্রণার মধ্যে আমাকে জাগাল, জাগাল আমার তৃষ্ণাকে। যে-তৃষ্ণা ছিল আমার নারী-রক্তে, যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম, সে ছায়ার মধ্যে এসে আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। তাকে যে আমি আপন করে নিয়েছিলাম এই ক'দিনের মধ্যে। আমি তার মৃত্যু চাই নি। তবু যেন সে ভয় পেয়েছে। সেই আশঙ্কায় সে চলে গেল আমার কাছ থেকে।

হ্যাঁ, আমি চাই। সে-তৃষ্ণার নিবারণ চাই। না, আমি উল্লসিত নই। আমি খুসী হই নি। টোপনের মত কে একজন

আমায় হাতছানি দিয়ে গেল। আমি মনে মনে পাগলের মত তার পেছনে ছুটেছি—তাকে ধরবার জন্যে। কিন্তু সে তো ছায়া-হরিণ। তা জেনেও তৃষ্ণা থামতে পারছে না। ছুটছে। আর নিশ্চিত ব্যর্থতা নিশ্চিত যন্ত্রণার মত আমাকে বিঁধছে।

তুমি জিজ্ঞেস করলে, 'এখন?'

'পাটনায় ফিরে যাব।'

আমাকে যেতেই হবে। দুঃখ পেয়ো না, শেখর। আমি একটা ভাঙ্গা মানুষ। জানি, তুমিও তাই। দুটো ভাঙ্গায় মিলে একটা গোটা হয় কি? অনেক সময় হয়তো হয়। আমাদের ক্ষেত্রে হবে কি? তাই ভাবব। আমার নতুন ভাবনা, আমার নতুন তৃষ্ণার হাতছানি।

শেখর, মুখ তুলে ভাল করে তাকাও। আমায় বিদায় দাও। আমি যাব—তোমার কাছে বার বার ফিরে আসবার জন্যেই—যতদিন না একেবারে আসতে পারি।

॥ শেখর ॥

আবার ফাঁকা হয়ে গেল কোলকাতা। চন্দনা নেই, কাজকর্ম থেকেও নেই। মন নেই কিছুতে। মন যেন জড়বস্তুর মত এক পিণ্ড আকারে নিশ্চল হয়ে বসে আছে।

এই জড়ত্ব বিশ্রী লাগে শেখরের। একটা কিছু সে করতে চায়। কর্মহীনতা তাকে কী রকম অদ্ভুত করে তুলছে। এর থেকে মুক্তি পেতেই হবে।

নিয়মিত যাচ্ছে জুট মিলের ইউনিয়ন অফিসে, রাজনীতির ওপর বিতর্ক করছে, যাচ্ছে পরিচিত কাগজের অফিসে, সেখানে সাহিত্যের সৌন্দর্য থেকে বাণিজ্য পর্যন্ত আলোচনা চালাচ্ছে, কলেজে অধ্যাপনার

চাকরীর জন্য দরখাস্ত করে যাচ্ছে, ভাবছে রিসার্চে নাম লেখাবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক জগতের সংকটের ধাক্কা যত জোরে প্রথমটা লেগেছিল, এখন ক্রমে সয়ে যাচ্ছে। পূর্বের উৎসাহ নেই ঠিকই, কিন্তু চূড়ান্ত হতাশাও নেই। অনেকেই এর মধ্যে নতুন করে জগৎকে বুঝে নেবার চেষ্টা করছে—শেখরও। হোঁচট খাচ্ছে যথেষ্ট—পৃথিবীর পথ এর আগে এত অসমতল কখনও ছিল না। বন্ধুদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা আছে, আবার তার ওপর দিয়ে তারা হাঁটছেও। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এইবার একটা কিছু ভাল করে লিখবে, এই প্রত্যাশায় কাগজের ওপর আঁকিবুকি কাটছে শেখর। তার দু'একটা পত্র-পত্রিকায় বেরোচ্ছে, এবং যথারীতি নিন্দা বা প্রশংসা অথবা ঔদাসীন্য কুড়োচ্ছে।

সবই চলছে। কিন্তু ঢিলেঢালা। উৎসাহহীন। জড় যেন। এই নিষ্ক্রিয়তা তাকে কুরে কুরে খায়। সে একটা কাজে নামতে চায়। আর ভাবনা নয়। ভাবনার শেষ নেই। কাজের ধাক্কায় ভাবনা নতুন হোক। পজিটিভ কোন কাজ। সব জোর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় শেখর। ব্যর্থতার ভয়ে কাজে ঝাঁপ না দেওয়া হাস্যকর, অপৌরুষেয়।

এক এক সময় সে ভাবে, চন্দনার কাছে চলে যাবে। ত্রিশংকু অবস্থা কাটানো যাক। একটা গড়ার কাজে হাত দেওয়া যাক। চন্দনার দ্বিধা ভেঙ্গে এগিয়ে যাবে সে।

এই রকম সময় অপ্রত্যাশিত একখানা চিঠি এল—রুমীর কাছ থেকে। দেখা করতে লিখেছে। কী কারণ, ভেবে পেল না শেখর।

তবু একদিন চলে গেল রুমীর বাড়ীতে। টোপন চলে যাবার পর এই প্রথম। টোপনের সঙ্গেই তো এদিকের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, তবে আবার রুমী ডাকল কেন?

'আশ্চর্য হয়ে গেছ, না?'

'তা একটু হয়েছি।'

'কেন ?'

'সব—সব কিছুই আশ্চর্যের। এখানেই আমাদের আলাপ, সান্নিধ্য, আবার বিচ্ছেদ, বিরাগ। এখানেই টোপনকে পেলাম, আবার হারালাম। সবই আশ্চর্য।' হেসে যোগ করল শেখর, 'এই সব। প্রায় দার্শনিকের মত বলছি বোধ হয়, তোমার বিরক্তি লাগছে।'

'না। বিরক্তি লাগছে না। এমন কি, তুমি শুনলে অবিশ্বাস করবে—ভাল লাগছে। নিজের জীবনের বাইরে হলে আমার দার্শনিককেও ভাল লাগতে পারে।'

রুমাকে বড় ঠাণ্ডা লাগছে, বড় শান্ত। প্রায় বিধবার মত একটা বৈরাগ্য নিয়ে বসে আছে সে। মুখে এখন একটা মৃত্যুর ছায়া লেগে আছে। কাপড় পরেছে সাদা। রুমী এমনিতেই রঙ্গীনের ভক্ত, আর ডিভোর্সের পর সে যেন প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে রাখত কাপড়ে। হঠাৎ সে আগুন নিঃশেষ হয়েছে, সাদা ছাই উড়ছে তাকে ঘিরে। [illegible] বেড়ে গেছে রুমীর।

'কেন [illegible]?'

রুমী বলল [illegible] আস্তে, প্রায় বিষণ্ণ গলায়, 'যদি বলি—এমনি, যদি বলি—[illegible] করছিল, তাহলে ভাববে ন্যাকামি, এখনি উঠে চলে যাবে।'

অন্য সময় [illegible] শেখর চটে উঠত। এখন অস্বস্তিটা প্রকাশ করতে সংকোচ [illegible]

রুমা একটু [illegible] হেসে বলল, 'তোমায় দেখে আমার এখনও মাঝে মাঝে আশ্চর্য লাগে।' তারপর হাসিটা মুছে বলল, 'বোধ হয় কোন সম্পর্ক [illegible] মরে না।'

শেখর চুপ করে রইল।

'জানি না এখন কী হবে!' নিজের মনেই বলে গেল রুমী,

'ডিভোর্সের পরেও সম্পর্ক ছিল, টোপনকে ঘিরে হয়তো শত্রুর মত করেও ছিল, আজও আছে। আমরা কেউই আর নতুন সম্পর্কে যাই নি বলে বোধ হয় রয়ে গেছে। দু'চার দিন বাদে যখন আমরা দুজনেই আবার বিয়ে-টিয়ে করে ফেলব তখন হয়তো সম্পর্কটা মরে যাবে। যাবে কী না কে জানে। জোরটা কমে যায়, একেবারে মরে না বোধ হয়। যাকগে, তুমি বোধহয় বিরক্ত হচ্ছো। একটা দরকারেই ডেকেছি।'

'কী দরকার ?'

'কয়েক দিন বাদে সব বন্ধুদের একটা নেমন্তন্নে ডাকব। এক শুধু তোমাকে ছাড়া। তাই আজ ডাকলাম।'

'কীসের নেমন্তন্ন।'

'না, আজ খাওয়াবার কোন প্ল্যান নেই। শুধু কথাটা বলব। তোমাকে বলতেই হবে এমন কোন কথা ছিল না। কিন্তু ইচ্ছে করল। শেখর, আমি বিয়ে করছি।'

শেখর রুমীকে পরিপূর্ণ ভাবে দেখতে লাগল। না, শেখরের প্রতি কোন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে না প্রচ্ছন্নভাবে। বরং রুমী যেন বড় ক্লান্ত।

'কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌। কাকে ? অসীমকে ?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু দিন আগে বলেছিলে, ওকে তুমি ভালবাসো না।' ইতস্তত করে বলে ফেলল শেখর।

'না, বাসি না।'

'তাহলে ?'

'ভালবাসা একটা মীথ্‌। কেউই পায় না। সীনিকাল্‌ লাগছে ?'

'কী ভেবে করছ ?'

'আর কিছু ভাবতে পারছি না বলে করছি। আমি বড় একা হয়ে গেছি। ডিভোর্সের পরে হয় নি এটা। টোপন ছিল।

টোপন চলে যাওয়ার পর—' আঁচলে মুখটা চেপে ধরল রুমী। একটুক্ষণ পরে চোখটা মুছে আঁচল সরাল। 'ভীষণ একা হয়ে গেছি। আর, তোমার সঙ্গে তো পারলাম না। কারুর সঙ্গেই কি আমি কিছু গড়তে পারব না? নিজের ওপর অবিশ্বাস জন্মে যায়, হতাশা আনে। নিজেকে ভয় করতে স্রুরু করেছি। তাই দেখি একবার চেষ্টা করে, যদি পারি। জানি, শক্ত। তবু, তবু—'

তবু তবু। প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো কথা দুটো শেখরের কানে। যেন এ কথা তারও বলবার। তবু, তবু। যেন তারও কিছু করবার আছে। চেষ্টা করে দেখা—যদি কিছু পারা যায়।

শেখর বলল, 'আমাদের সম্পর্ক ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তোমার এই নতুন সম্পর্ক সার্থক হলে আমি খুশী হব। নিছক সৌজন্যের খাতিরে বলছি না কথাটা।'

শেখর উঠল: 'চলি আমি।'

'যাওয়ার আগে আর একটা কথা শুনে যাও।'

শেখর থামল।

রুমীর গলা কাঁপছে। বলল, 'অনেক ব্যাপারে অনেক খারাপ তুমি মনে করেছ আমায়। অনেক সময়ই তাতে আমার কিছু এসে যেত্তো না। কিন্তু একটা কথা তুমি ভাবো, জানি আমি। সেটা ঠিক নয়। আমি টোপনের মৃত্যু ঘটাই নি। বিশ্বাস কর। বিশ্বাস কর।'

রুমী চোখে আঁচল চেপে কাঁদতে লাগল।

'একথা কেউ ভাবছে মনে হলে জীবনে আর—আর—কিছু করতে ইচ্ছে করে না—বাঁচতেও ইচ্ছে করে না।'

'আমি আর মনে করব না।'

'এই বোধহয় শেষ দেখা আমাদের।'

'বোধহয়।'

'আমি এত কথা বললাম। তোমার একটা কিছুও বলবার নেই?'

'তুমি যেন সুখী হতে পারো।'

রাস্তায় বেরিয়ে শেখরের মনে হলো, রুমী এতটা কেন নিজেকে খুলল তার কাছে। টোপনের মৃত্যুই হয়তো কারণ।

রাস্তায় ঘুরে ঘুরে এলো সে এস্প্লানেডে। এইখানে একটা রেস্তোরাঁর একটা কোণে সে এক কাপ কফি নিয়ে এখন অনেকক্ষণ বসে থাকবে, আর মনটা উলটে পালটে দেখবে।

কিন্তু বিধি বাম।

'হেল্লো, শেখর না?' পাশে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল।

'উঠে এসো, উঠে এসো।' ট্যাক্সির দরজাটা খুলে গেল।

শেখর দেখল—প্রবাল।

ততক্ষণে প্রবাল তাকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়েছে।

॥ প্রবাল ॥

কি হে, কোথায় যাচ্ছ? কী ব্যাপার? দেখাই পাওয়া যায় না, একেবারে ডুমুরের ফুল যে! কাজ নেই তো এখন? আঃ, গভীর শান্তি দিলে। তোমার কাজ নেই এমন দিনও তাহলে পাঁজিতে লেখে! চল তাহলে একটু বসি একসঙ্গে—গ্রেট ইস্টার্নে। ওখানে একজনের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। না, না, সে দেরী আছে। ততক্ষণ আমরা একসঙ্গে বসে পরস্পরের সঙ্গসুধা পান করতে পারি। একজন মহিলার সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে। হ্যাঁ, এইসব নিয়েই আছি। মন্দ কি! কটা দিনই বা বাঁচব। এই তো এসে গেছি। নামো। চল চাইনীজ কর্ণারে। পানীয় ছাড়াও ওখানে কিছু প্রাচ্য ভক্ষ্যও নেওয়া যাবে। বসি চল ঐ কোণটাতে। বল, কী কী খাবে। আচ্ছা, তোমার সংকোচ হলে আমি বলে দিচ্ছি। এইবার একটু জমিয়ে বসা যাক। তুমি

যেন একটু গম্ভীর মনে হচ্ছে। কী খবর? রুমীর বিয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ! আরে এ তো তোমার আনন্দের কথা। আনন্দই হচ্ছে? তাহলে এত ভাবছ কেন! ভাবছ, আশ্চর্য হচ্ছো। কী ব্যাপার—আবার রুমীর প্রেমে দ্বিতীয়বার পড়ে গেলে না কী! আপন্ গড্ বলছি ব্রাদার, যদি জ্যোৎস্না আবার বিয়ে করে ফেলত, বড় একটা স্বস্তি পেতাম। কিন্তু তিনি সতী সাধ্বীর মত—নাঃ, সত্যি, এক এক সময় বড় খচ্‌খচ্ করে। হঠাৎ মনে হয়, যেন কী একটা অপরাধ করে বসে আছি। অবিশ্যি সে সব বোধ খুব ক্ষণস্থায়ী, এই যা সুবিধে। নইলে মুস্কিলে পরে যেতাম। এই যে একক বাস, এবং স্বচ্ছন্দবিহার—এর গলায় দড়ি পড়ে যেত। পান ও ভোজন সুরু কর হে। আলাপের সঙ্গে সঙ্গে ওটা চলুক। ব্রাদার, তুমিও এবার হোটেলবাসী হয়ে পড়। তুমি মুক্ত, ফ্রী, স্বাধীন। না, তা তো তুমি পারবে না ব্রাদার, এই যে আমি সমাজ-সংসার পরিত্যাগ করে একা একা হোটেল-জীবন যাপন করি, এতে তুমি ঈর্ষা বোধ কর, না ঘৃণা বোধ কর? নিরুত্তর যে! জানি, তুমি ও দুটোই কর। জেনে রাখো, বেশির ভাগ মানুষ কিন্তু ঈর্ষাটাই বেশি বোধ করে। মনে মনে এখন সবাই হোটেলবাসী, একা, স্বতন্ত্র। নানা কারণে আমার মত বেরিয়ে পড়তে পারে নি, এই যা। তুমি একটু ঘৃণা আমায় কর জানি—তোমার ঐ আদর্শের প্রভাবে। কিন্তু ব্রাদার, তুমিও প্র্যাকটিক্যালি একাই, থিয়োরেটিকালি যাই হও! আমাদের মত চিরহোটেলবাসী দিন দিন বাড়ছে, টাকায় কুলোতে পারলে আরো বেশি হতো। আর যারা বাড়ীতে থাকে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো, তার মধ্যে অনেক লোক বাড়ীকে হোটেলের মতই ব্যবহার করে। আসে যায়, খায় ঘুমোয়—ব্যস, ঐ পর্যন্তই সম্পর্ক। আরে, কত স্বামী-স্ত্রী পর্যন্ত বিয়ের পর একা একা থেকে যায়—ঐ যৌন মুহূর্তগুলো ছাড়া। হ্যাঁ হে, হাত-মুখ চালাও, শোষণ-চোষণ বন্ধ রেখো না। বুঝলে হে

ব্রাদার, এখন সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত! নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে, নিজের একটু সুবিধে করে নিতে। এমন কি যারা রাজনীতি করে তারাও অনেকে তাই। কেউ বর চাইছে এম, পি—এম, এল, এ, কেউ বা অন্য কিছু। আমরাও তাই—সর্বদা নিজের কোলে ঝোল টানছি। বলতে পারো, এই তো নানা খাতে অপচয় করি। ভাবলে বুঝতে, অপচয় নয়। কোন দায়িত্ব নেব না, অথচ ফুর্তিটুকু নেব, তার জন্যে তো একটু চড়া দাম দিতেই হবে। দিলাম। গোটাকয়েক টাকার ওপর দিয়ে গেল। গায়ে খাটতে হলো না, সর্বদা দুশ্চিন্তা কাঁধে নিয়ে বসে থাকতে হলো না। যে মুহূর্তে ইচ্ছে তুমি মুক্ত। ভাগ্যবান নই আমরা—আমি। আমি এখন তোমার সঙ্গে বসে আছি, চাই কি, তোমার আদর্শ নিয়ে একটু আলোচনাও করতে পারি। কিন্তু এই তুমিই যদি আমাদের কারখানার মজুরদের মধ্যে তোমার আদর্শ-প্রচারে নেমে যাও, এবং তাদের দাবীর—ন্যায্য দাবীরই—জন্য লড়তে থাকো, তাহলে কি আমি তোমার সঙ্গে থেকে চাকরীটা স্টেক করব নাকি! মোটেই না। মুহূর্তে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব এবং নিজের স্বার্থটুকু দেখব। এখন সারা দুনিয়া উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গেছে—হাঃ হাঃ। সবারই মন্ত্র—আত্মানং বিদ্ধি। সবাই নিজেকে জানছে। শুধু নিজেকে, আর কাউকে নয়, কিছু নয়, শুধু নিজে। এই হচ্ছে একালের ফিলজফি। যে যত তাড়াতাড়ি এ ফিলজফি শিখে ফেলতে পারে, ততই মঙ্গল। ওঃ, ঐ আমার—বান্ধবী—এসে গেছেন। ফিলজফির থিয়োরেটিক্যাল বক্তৃতা এখন থাক, কিছু প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন দিই। তুমি কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে বসতে পারো। হ্যাঁ, কিছুক্ষণ।

একটু বসেই হয়তো শেখর চলে আসতো। হঠাৎ চোখ পড়ল একটা টেবিলে বসে দীপা। দলে ছিল, দলটা উঠে যেতে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল।

'আমি বরং ঐ টেবিলে যাচ্ছি। ওখানে আমার একজন বান্ধবীকে দেখতে পাচ্ছি।'

'হা! ইজ্ দ্যাট্ সো! লাক্!'

শেখর এসে বসল দীপার টেবিলে।

দীপা বলল, 'আগেই দেখেছি। সেইজন্য দল ছেড়ে দিয়ে ওয়েট্ করছি।'

'সো কাইণ্ড্ অব্ ইউ।'

'কিন্তু তুই এত আনকাইণ্ড্ কেন? কেষ্ট ঠাকুরটির মত বৃন্দাবন থেকে সেই যে বিদায় নিস, আর ফেরবার নাম করিস না মথুরায়, এদিকে গোপিনীরা হেদিয়ে মরে। কী, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ন্যায়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো? বেশি বকছি? বকবই। এতদিন পরে দেখা। তায় পান করেছি। এবং আরো একটু করব—তোর সম্মানে। বেয়ারা—।'

'কেমন আছিস বল।'

'অ্যাজ য়ুজুয়াল্। 'ভালও বলতে পারিস, মন্দও বলতে পারিস।'

'এনি নিউ ডিভেলাপমেণ্ট?'

'দূর, দূর।'

'তাহলে খুঁজে পাওয়া গেল না? সোনার হরিণ?'

'ঠাট্টা করে যা-ই বলিস, আমার সোনার হরিণই চাই।'

'আর কত দিন চলবে খোঁজ।'

'মৃত্যু পর্যন্ত।'

'না। যৌবন পর্যন্ত।'

'হ্যাঁ, যৌবন পর্যন্ত পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু তা না পেলে সারা জীবনই অপেক্ষা করতে হবে।'

'দীপা, একটা কথা বলব?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

'তুই বিয়ে করে ফেল্।'

হেসে উঠল দীপা: 'ডিভোর্সের অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে? তোর মতো—?"

'দীপা, মানুষ পরিপূর্ণ হয় না। তাই নিজের চাওয়াকে একটু ছেঁটে-ছুটে নিতে হয় বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য করবার জন্যে।'

'সামঞ্জস্য করে করে বাঁচতে পারব না। বাঁচার জোরেই সামঞ্জস্য হবে—অন্তত হোক তাই চাই।'

'আশ্চর্য! এত বয়স হয়ে গেল!'

'অর্থাৎ বয়স আমাকে বুড়ো করতে পারে নি এই তো? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমার উর্বশী নাম যেন সার্থক হয়। তোর অনুমতি নিয়ে আর একটু পান করি, শেখর।'

'আশ্চর্য! ক্লান্ত লাগে না? একা লাগে না?'

'আমার চেয়ে ক্লান্ত কে বেশি! আর একা!' করুণভাবে হাসল দীপা। 'ভীষণ একা। ঐ যে আড্ডা এতক্ষণ এখানে উৎসব সাজিয়ে বসেছিল, ওরা আমার কেউ নয়, শেখর। আমার কেউ নেই। তা বলে আমি ভিক্ষুকও তো নই যে যা পাব হাত পেতে নেব। আমি যে রাজেন্দ্রাণীর মত যেতে চাই আমার প্রেমের রাজার কাছে। রাজা না পেতে পারি, তা বলে চরিত্র ছাড়ব কেন? শেখর, সে-ই তো হতো ব্যভিচার। যাকে পূর্ণ পুরুষ বলে মনে হয় না, যাকে পুরো ভালবাসি না, তাকে বিয়ে করে আপোষ করে পুরোটা দেব কী

করে! দিতে গা ঘিনঘিন করবে। যে স্বামী নয় জানি, তাকে স্বামী বলে পরিচয় দেব কী করে!'

'আর এই ক্ষণ-অতিথিদের বেলায়— ?'

'না, ব্যভিচার নয়। দু-এক জনের সঙ্গে দেহ-সম্পর্ক ঘটেছে আমার, ঠিকই। কিন্তু সে উত্তেজনার মুহূর্তে, বলতে পারিস অসুস্থতার মুহূর্তে, সে আমার স্ব-ভাব নয়। বেঁচে থাকার জন্যে যতটুকু বিকার অপরিহার্য ততটুকু মাত্র। এই যে মদ খাচ্ছি, কিন্তু এর দাস আমি নই। যেদিন সেই রাজাকে পাব, মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পারব—যদি সে তাই চায়। যাক্, তোর কথা বল্। বন্ধুদের খবর কী সব ?'

'বড় খবর আছে। রুমীর বিয়ে।'

'হুর্-রে। তোর সঙ্গেই পুনর্মিলন নাকি ?'

'না, না। অসীম।'

'হুর্-রে। বেয়ারা। তোর রি-অ্যাকশন্ কী ?'

'কী রকম আশ্চর্য লাগছে।'

'কেন ?'

'রুমীর কথা শোনার পর থেকেই মনে হচ্ছে, আমি ওকে হয়তো পুরো জানি না। আমি তো ওকে ভেবেছি আত্মসর্বস্ব। আমার ধারণা, আমি ওকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য ম্যাক্সিমাম চেষ্টা করেছি। আর ও যখন এখানে ব্যর্থ হলো, সর্বত্রই হবে।'

'হয়তো তোর পক্ষে স্যুটেব্‌ল্ ছিল না।'

'হয়তো তাই। কিন্তু আমার মনে হলো, ও টৌপনের মৃত্যুর পর বদলে যাচ্ছে।'

'অসীমকে ও ভালবাসে ?'

'না। তবু অসীমের ভালবাসাকে মর্যাদা দিয়ে নতুন করে সুরু করবে।'

'আর কি ভাবলি ?'

'অনেক কথা। পুরোনো দিনের সব ব্যাপার—যখন রুমী আমার স্ত্রী ছিল। খুঁটিনাটি, নানা তুচ্ছ ব্যাপার।'

'মনে হচ্ছে, আবার নতুন করে ওর প্রেমে পড়লি।'

'না। তবে ভাবিয়েছে। দীপা, তোর মনে হয় না যে তোরও একটা চেষ্টা করে দেখা উচিৎ?'

দীপা হেসে উঠল: 'কাকে নিয়ে? তোকে নিয়ে?'

'না। তা সম্ভব নয় জানি।'

'তাহলে?'

'হ্যাঁ, লোক পাওয়া ভার, জানি। তবু যদি বিয়ে-থা করে সুখী হতিস, আমার ভাল লাগতো। এরকমভাবে কত দিন চলবে!'

'বটে, বটে। বেশ ঠাকুমা-দিদিমার মত লাগছে। বলে যা।'

'আর একটা বড় খবর আছে, দীপা। আমি বিয়ে করছি।'

'হুর্‌-রে। বেয়ারা, বেয়ারা। জলদি, জলদি। কাকে?'

'চন্দনাকে।'

'হুর্‌-রে। রুমীর খবরের পরেই ঠিক করলি নাকি?'

'না। অনেকদিন ধরেই ভাবছি।'

'কী সব তোদের সমস্যা ছিল, সে সব মিটেছে?'

'না।'

'তবে?'

'জীবনে সব সমস্যা বোধহয় কোন দিনই মেটে না। সমস্যা মেটাতে মেটাতেই হয়তো চলতে হয়।'

দীপা পান করতে লাগল।

শেখর বলল, 'আর এ যুগে হয়তো একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট কোন দিন হব না। হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে আমার খারাপ লাগে। একটা কিছু আদায় করতেই হবে। নইলে ইট-কাঠের মত জড় হয়ে যাচ্ছি। মৃত যেন। সে বড় বিশ্রী—প্রতি মুহূর্তে সচেতনভাবে জড় হয়ে যাওয়া। দীপা, এক সময়ে ভেবে দেখিস্‌ যে তুই জড়

হয়ে যাচ্ছিস্ কিনা। জড় হয়ে যাওয়াই জীবনের সব চেয়ে বড় ব্যভিচার। সেই ব্যভিচারের হাত থেকে বাঁচতে চাই আমি। একটা কিছু কাজ—গড়ার কাজ—যে না করে সে-ই বোধহয় জীবনের ক্ষেত্রে ব্যভিচারী।'

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল দীপা। অনেকক্ষণ। নেশায় অথবা চিন্তায় কে জানে।

যখন রাত গভীর হলো, দীপা বলল, 'ভাবব শেখর। যদি সব ভেঙ্গে যায় আমার, যদি নতুন করে ভাবা স্থুরু করতে হয়, তবু ভাবব। তুই এলে আমার বড় ভাল লাগে, শেখর। তোর কাছে অনেক কথা শুনি, সেগুলো মনের মধ্যে তোলা থাকে, সময় পেলেই নাড়াচাড়া করি। কখনও রাগি, কখনও মানি, কখনও হতাশ হই, কখনও আনন্দ পাই। আমি তোর কথা ভাবি, শেখর। আরো ভাবব। করা—কিছু গড়া—হ্যাঁ। তুই তো নিজেকে ধ্বংসস্তূপ মনে করিস, তুইও গড়ার কথা ভাবছিস। ভাল। তোর আদর্শ বোধহয় তোকে কিছুটা ধরে রেখেছে, একেবারে ভেঙ্গেচূড়ে পড়তে দেয় নি। আমার তো ঐ রকম কোন আদর্শ নেই।'

'চল্, অনেক রাত হয়েছে।'

'আর একটু বোস্। আর বোধহয় আমরা কোন দিন এমন ভাবে বসব না। এত একা হব না।'

'কেন ?'

'তোর বিয়ে হয়ে যাবে।'

'তাতে কি ?'

'তাতে অনেক কিছু। তোকে আমার মাঝে মাঝে ভয়ংকর দরকার হয়ে পড়ে, শেখর। মনের মধ্যে অনেক কথা জমে ওঠে, বলবার লোক পাই না। না শেখর, ঐ ক্ষণ-অতিথিদের বলা যায় না। ওরা বোঝে না, বুঝতে চায় না। তখন তোকে আমার বড় দরকার হয়ে পড়ে। তখন মনে হয়, হ্যাঁ, সত্যি আমি বড় বেশি

একা। একটা কথা বলার লোক নেই। তা হোক, হাতের ওপর হাতটা রাখ্। কন্‌গ্রাচুলেশন। এ বিয়ে যেন চিরসুখের হয়। আমার আদর্শ যেমন সুখ, তেমনি হয়।'

'চল্ এবার।'

'চল্। শেখর, আজ তুই আমায় একটু পৌঁছে দিয়ে যাস।'

'হুঁ।'

ট্যাকসিতে দীপা গা হেলিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

'কী, এত চুপচাপ?' বলল শেখর।

'ভাবছি।' হাসল দীপা। 'ভাবতে স্বরু করলাম।'

ট্যাকসি থামল। দীপা নামল। বলল, 'বিদায়।'

মুখ ঘুরিয়ে ট্যাক্‌সি উলটো মুখে ছুটল শেখরকে নিয়ে। জোরে লাগছে রাতের হাওয়া। ঠাণ্ডা। মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে সারা গা দিয়ে হাওয়াটা নিচ্ছে আর ট্যাকসির গতিটা যেন তার মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে।

ধ্বংসস্তূপের সব টুকরোগুলো কুড়োতে কুড়োতে আমি তোমার কাছে আসছি, চন্দন।

সমস্ত শক্তি সংহত করে আমি তোমার কাছে আসছি, চন্দন।

আমার বন্ধ্যা ভূমির ওপর তুমি এসে দাঁড়াও, চন্দন, আমার জড়ত্ব-শাপ বিলীন হোক।